মানুষ প্রাণী ও সংস্কার

প্রসাদ রায়
আনন্দ ঘোষ হাজরা

মানুষ প্রাণী ও সংস্কার

প্রসাদ রায়
ও
আনন্দ ঘোষ হাজরা

॥ প্রকাশক ॥
দি বুক ট্রাস্ট
৫৭-বি, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক :
অলক মুখোপাধ্যায়
দি বুক ট্রাস্ট
৫৭-বি, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : ২৬শে জানুয়ারি, ১৯৮৯

মূল্য : দশ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীস্বপন কোলে
নিউ মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

শ্রীমান অনীশ মুখোপাধ্যায়
শ্রীমান অর্ণব মুখোপাধ্যায়কে

ভূমিকা

বইটির ভূমিকার বিশেষ কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। শুধু একটি কথা বলা আবশ্যক। মূল আলোচ্য বিষয়টি হলো, মানুষের সঙ্গে প্রাণি-জগতের সম্বন্ধ এবং তজ্জনিত বিভিন্ন সংস্কার। এটা করতে গিয়ে কিছু আদিকথার অবতারণা করতে হয়েছে। যদিও 'আদিকথা', কিন্তু বাস্তবিক এই আদিকথার অন্তর্গত প্রত্যেকটি বিষয়ই অনাদি এবং অনন্ত। প্রত্যেকটির অন্তর্গত বিষয় যেমন, যুগবিভাগ, মহাদেশীয় অপসৃতি, তুষার যুগ, সভ্যতার বিবর্তন (নিওলিথ পর্যন্ত) ইত্যাদি নিয়ে বেশ বৃহদাকার পুস্তক বা কয়েকটি পুস্তক রচিত হতে পারে তথ্য প্রমাণ উল্লেখ ক'রে। বইটির ক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই বলেই কেনোজোয়িকের মধ্যে কোয়ারটারনারি ও টারশিয়ারির উল্লেখ করিনি। অক্সিজেন বিপ্লবের কথাও বলা হয়নি। সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলি, বিবর্তনবাদ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিবর্তন, উদ্ভিদজগতের ও প্রাণিজগতের নামকরণ পদ্ধতি, কিছু উল্লেখ করা হয়নি—খানিকটা পরিসরের জন্যও বটে, খানিকটা আবার বিষয়টাকে অত্যধিক গুরুভার করতে চাইনি বলে। মূল আলোচ্য বিষয়টিও দীর্ঘতর করা যেতো। আসলে অধ্যায়দুটি দুটি পৃথক নিবন্ধ হিসাবে মনেকরা যেতে পারে। খুব দ্রুত এই ছোট বইটি পাঠ ক'রে যদি কেউ কৌতূহলী হয়ে ওঠেন তাহলেই এই শ্রম সার্থক। অবশ্য এই কথাগুলি এতদ্বিষয়ে অভিজ্ঞজনের বা বিজ্ঞজনের প্রতি অবশ্যই প্রযোজ্য নয়। তাঁদের কাছে বইটির কোনো গুরুত্ব আছে কিনা, সেটাই প্রশ্ন।

প্রসাদ রায়

আনন্দ ঘোষ হাজরা

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বিষয় ... পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

আদিকথা

মানুষ, প্রাণী ও সংস্কার এই তিনটি শব্দের ব্যাপ্তি অত্যন্ত বিশাল। আমরা মূলত আলোচনা করবো মানুষ ও প্রাণিজগতের সম্পর্কের কথা ও সেই সূত্রে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেশে অন্যান্য প্রাণীদের সম্পর্কে মানুষের যে বিভিন্ন ধরনের সংস্কারের জন্ম নিয়েছে তার কথা। বলা বাহুল্য, এ আলোচনাও অবশ্য সম্পূর্ণ নয়।

আমরা মানুষ শব্দটি আগে ব্যবহার করছি বটে, কিন্তু মনুষ্যেতর নানা ধরনের প্রাণীর জন্ম পৃথিবীতে মানুষের অনেক আগে। উদ্ভিদের জন্ম তারও আগে। কিন্তু উদ্ভিদকে আমরা আলোচনার মধ্যে আনবো না। মানুষের ও অন্যান্য প্রাণীর সম্পর্কের কথা বলার আগে তাই, এই পৃথিবীতে, মানুষের অত্যন্ত অল্প সময়ের বসবাসের ধারণার একটা প্রেক্ষিত থাকা প্রয়োজন। যদিও বিষয়টি বিশাল, তবুও খুব সংক্ষেপে এই ধারণার কথা ব্যক্ত করার চেষ্টা করবো।

মহাবিশ্বের সৃষ্টি, বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন, প্রায় ১২,০০০ মিলিয়ন বছর অর্থাৎ ১২০০ কোটি বছর আগে কোনো ক্ষণে। তারও বহু বহু সময়ের পরে সৃষ্টি হয়েছে আমাদের পৃথিবীর। বৈজ্ঞানিকদের মতে প্রায় ৪৬০ কোটি বছর আগে। অর্থাৎ পৃথিবীর বয়স মহাবিশ্বের বয়সের অর্ধেকেরও কম। এরপর আরো বহু বহু দিন পৃথিবীর উপরিভাগ অত্যন্ত উতপ্ত তরল অবস্থায় ছিলো। ঠাণ্ডা হতে হতে, জীবনের বিকাশের উপযোগী হয়ে উঠতে সময়ে লেগেছে অনেক। পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো পাথরের সন্ধান মিলেছে গ্রীনল্যাণ্ডে, প্রায়

৩৮০ কোটি বছর আগেকার। তারপর তো প্রাণের কথা আসে। হয়তো ৩৫০ কোটি বছর আগেই প্রথম জীবনের স্পন্দন পৃথিবী অনুভব করে থাকবে, কারণ আদিম ব্যাকটিরিয়ার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে ৩৪০ কোটি বছরেরও পুরোনো পাথরে। তারপর থেকে কতো না জীব পৃথিবীর বুকে জন্মলাভ করেছে' কতো রকমের জীব বিবর্তিত হয়েছে, বর্ধিত হয়েছে, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে, আবার বিলুপ্তও হয়ে গেছে একদিন! প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের বিবর্তনকে মানিয়ে নিতে না পেরে কতো কতো দিন আগে তারা চলে গেছে পৃথিবী ছেড়ে। আবার কতো প্রাণী টিকে আছে হয়তো বিবর্তিত অবস্থায় কিংবা আদিরূপেই। বিবর্তনবাদের আলোচনার মধ্যে আমারা যাবো না, কিন্তু এই বিশাল কালসীমাকে মাপতে পণ্ডিতেরা পৃথিবীর বয়সকে বিভিন্ন যুগে ভাগ করেছেন। সেই যুগগুলির নাম ও স্থায়িত্বকাল সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক অতি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেবার চেষ্টা করবো।

যুগ বিভাগ

বর্তমান সময় থেকে প্রায় সাড়ে সাত কোটি বছরের সময়সীমাকে বলা হয় কেনোজোয়িক মহাযুগ। এই কোনোজোয়িক মহাযুগকে ভাগ করা হয়েছে কতকগুলি যুগে। যেমন—প্রায় সাড়ে সাত কোটি বছর আগে থেকে প্রায় ২·৮০ কোটি বছর আগের সময় পর্যন্ত কালকে—(১) প্যালিওসিন, (২) ইওসিন, ও (৩) ওলিগোসিন এই তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে। আবার ২·৮০ কোটি বছর আগে থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত (৪) মিওসিন, (৫) প্লিওসিন, (৬) প্লিসটোসিন এবং (৭) আধুনিক, এই চারটি যুগে ভাগ করা হয়েছে।

যুগ বিভাগ (চার্ট—১)

মহাযুগ	যুগ	স্থায়িত্বকাল (আনুমানিক)
কেনোজোয়িক	আধুনিক	
	প্লিসটোসিন	২০ লক্ষ ↓
	প্লিওসিন	১.২০ কোটি ↓
	মিওসিন	২.৮০ কোটি ↓
	ওলিগোসিন	৩.৯০ কোটি ↓
	ইওসিন	৫.৫০ কোটি ↓
	প্যালিওসিন	৭.৫০ কোটি ↓
মেসোজোয়িক	ক্রিটাসিয়াস	১৩.৬০ কোটি ↓
	জুরাসিক	১৯ কোটি ↓
	ট্রায়াসিক	২২.৫০ কোটি ↓
প্যালিওজোয়িক	পারমিয়ান	২৮ কোটি ↓
	কারবোনিফেরাস	৩৪.৫০ কোটি ↓
	ডেভোনিয়ান	৩৯.৫০ কোটি ↓
	সিলুরিয়ান	৪৩ কোটি ↓
	অরডোভিসিয়ান	৫০ কোটি ↓
	ক্যামব্রিয়ান	৫৭ কোটি ↓
প্রি-ক্যামব্রিয়ান	প্রোটেরোজোয়িক	১৬০ কোটি ↓
	আর্কিয়োজোয়িক	৩৬০ কোটি ↓
	অ্যাজোয়িক	৪৬০ কোটি ↓

কেনোজোয়িকের আগে মেসোজোয়িক মহাযুগ। এখন থেকে প্রায় ২২·৫০ কোটি বছর আগে শুরু। শেষ কেনোজোয়িক মহাযুগের

প্রারম্ভিক সময়ে। একটি বিশাল ভূতাত্ত্বিক আলোড়নের ফলে মেসোজোয়িক মহাযুগ শেষ হয়ে কেনোজোয়িক মহাযুগ আরম্ভ হয়। এই আলোড়নের নাম লারমাইড আলোড়ন। এর ফলে হিমালয়, রকি, এণ্ডিজ প্রভৃতি পর্বতমালার সৃষ্টি হয় ও মহাদেশগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মেসোজোয়িকের তিনটি অন্তর্যুগ—(১) ট্রায়াসিক (২) জুরাসিক (৩) ক্রিটাসিয়াস।

মেসোজোয়িকের আগে ছিলো প্যালিওজোয়িক মহাযুগ। এখন থেকে প্রায় ৫৭ কোটি বছর আগে থেকে শুরু হয়ে শেষ হয় মেসোজোয়িকের প্রারম্ভে। ঐরকম একটি ভূতাত্ত্বিক আলোড়নের ফলে প্যালিওজোয়িক মহাযুগ শেষ হয়ে মেসোজোয়িক মহাযুগ আরম্ভ হয়। এর ফলে আবার আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে, উত্তর আমেরিকার আপালাচিয়ান পর্বতমালার সৃষ্টি হয়। প্যালিওজোয়িক মহাযুগকে ছয়টি অন্তর্যুগে ভাগ করা হয়—(১) ক্যামব্রিয়ান (২) অর্ডোভিসিয়ান (৩) সিলুরিয়ান (৪) ডেভোনিয়ান (৫) কার্বনিফেরাস ও (৬) পারমিয়ান।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে প্যালিওজোয়িক মহাযুগের অর্থ হলো—প্রাচীন মহাজীবনের মহাযুগ, মেসোজোয়িক—মধ্য জীবনের মহাযুগ এবং কেনোজোয়িক—নতুন জীবনের মহাযুগ।

প্যালিওজোয়িক মহাযুগের আগের কালকে আগে শুধু প্রি-ক্যামব্রিয়ান বলেই অভিহিত করা হতো। যদিও অনেক মতানৈক্য আছে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এখনও, তবু প্যালিওজোয়িক যুগের আগের প্রি-ক্যামব্রিয়ান মহাযুগকে (১) অ্যাজোয়িক (২) আর্কিয়োজোয়িক ও (৩) প্রোটেরোজোয়িক এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়। অ্যাজোয়িক শব্দের অর্থ জীবনবিহীন; এই যুগ মোটামুটি ১০০ কোটি বছর। আর্কিয়োজোয়িকের অর্থ প্রত্নজীবন; এই যুগ মোটামুটি ২০০ কোটি বছর এবং প্রোটেরোজোয়িক অর্থাৎ প্রোটোজোয়া বা সরল জীবনের যুগ। শেষ যুগটি আনুমানিক ১০০ কোটি বছর।

অর্থাৎ মূলত দেখা যাচ্ছে প্যালিওজোয়িক অর্থাৎ প্রাচীন মহাজীবনের

মহাযুগ শুরু হয়েছে ৫৭ কোটি বছর আগে মাত্র। সৃষ্টির পর থেকে যে কেবল জীবনের উদ্ভব ও বিলয় হয়েছে তাই নয়, অনেকে বিপুল পরিবর্তনের ধাক্কাকে সামলে নিয়ে বেশ বেঁচে বর্তেও আছে অদ্যাবধি। প্রায় ৫৭ কোটি বছর আগে অনেক প্রাণীদের মধ্যে কঙ্কাল তৈরী হয়ে গেছিল বলে, এবং বহু রকমের প্রাণীর বিকাশ ঘটেছিল বলে ঐ সময় থেকেই প্যালিওজোয়িক মহাযুগ শুরু হচ্ছে বলে ধরা হয়।

মহাদেশীয় অপসৃতি

উপরে যে ভূতাত্ত্বিক আলোড়নের কথা বলা হয়েছে তার অন্যতম প্রধান কারণ মহাদেশীয় অপসৃতি (Continental drift)। ভূতত্ত্ববিদরা এখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে আমরা এমন একটি ভ্রাম্যমাণ এবং গতিশীল উপরিতলে বাস করি যে, পৃথিবীর এই উপরিতলের গতিশীলতা কোটি কোটি বছর ধ'রে ধীরে ধীরে পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক গঠনকে পাল্টে ফেলতে পারে। পৃথিবীর বহির্ভাগের প্রাথমিক স্তর হলো লিথোস্ফিয়ার যা মহাদেশীয় ভূমি ও সামুদ্রিক উপরিতল দ্বারা গঠিত। এই ভূমি ও উপরিতল খুবই পাতলা। কিন্তু এই তলটি আটটি প্লেটের ঢাকনার মতো। পৃথিবীর আভ্যন্তর প্রবাহোত্তাপজনিত সঞ্চলন লিথোস্ফিয়ারের এই প্লেটগুলিকে ঠেলে নিয়ে বেড়ায়। কখনও দুটি প্লেট পরস্পরের থেকে দূরে সরে যায়। তাতে গহ্বরের সৃষ্টি হয় ও গলিত পদার্থ ওপরে উঠে এসে আগ্নেয় পর্বতের সৃষ্টি করে। যদি মহাদেশীয় স্থলভাগের মধ্যে এই রকম ফাটল দেখা যায় তাহলে একটা বিশাল এলাকা উঁচু ও বিস্তৃত হয়ে উঠে মালভূমির আকার ধারণ করতে পারে। দুটি প্লেট একসঙ্গে সরে যেতে পারে। যদি দুটি প্লেটের মধ্যে একটি পাতলা দুর্বল সমুদ্রতল হয় ও অন্যটি হয় মহাদেশীয় তলভাগ তাহলে সমুদ্রতলটি ধাক্কা খেয়ে নীচের দিকে চলে যেতে পারে। তাতে সমুদ্রতলে একটি গভীর খাতের সৃষ্টি হতে পারে এবং এভাবে নীচে গিয়ে সমুদ্রতলের জল পুনরায় স্থলভাগের ওপর চুঁইয়ে উঠতে পারে। কিন্তু যদি দুটি প্লেটই

শক্তিশালী কঠিন মহাদেশের স্থলভাগ হয়, তাহলে কেউ কাউকে ঠেলে নীচে নামাতে পারে না এবং তখন পরস্পরের ধাক্কায় এবং প্রান্তভাগের ঘর্ষণের ফলে বড় শৈলশ্রেণীর উদ্ভব হতে পারে। আবার দুটি প্লেট পরস্পরের সঙ্গে গড়িয়ে মিশে যেতে পারে। তাহলে সৃষ্টি হয় বিশাল স্তরভঙ্গের।

স্পষ্টতই এই রকম অপসৃতি ও বিচরণের ফলেই পৃথিবীর উপরি-ভাগে মহাদেশগুলি স্থান পরিবর্তন করে, নতুন সমুদ্র সৃষ্ট হয়, পুরাতন সমুদ্র লুপ্ত হয়। বহু কোটি বছর ধরে এই ধীর অপসৃতির ফলেই পৃথিবীর ভূভাগ বদলে যায় ভীষণরকমভাবে এবং একদিন সেটা লক্ষ্য-গোচর হয়। বছরে দু' ইঞ্চি পরিমাণ গড়ে, প্লেটগুলি সরে সরে যায় বলে ভূতাত্ত্বিকেরা মনে করেন। এই অপসৃতিজনিত পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর আবহওয়া ভীষণ পরিবর্তিত হতে পারে। আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে এবং ভূখণ্ডের অপসারণের ফলে এক দেশের প্রাণী অন্য দেশে চলে যেতে পারে। সেখানে নতুন আবহাওয়ায় নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে বিলুপ্ত হতে পারে অথবা অনুকূল আবহাওয়া পেয়ে বিবর্তিত হয়ে অন্য প্রাণীতে পরিণত হতে পারে বা বংশবৃদ্ধিও ঘটাতে পারে।

প্রি-ক্যামব্রিয়ান মহাযুগের শেষে মহাদেশগুলি একত্রে যুক্ত ছিলো। ক্যামব্রিয়ান মহাযুগের প্রথমে এটি ভেঙে চারটি টুকরো মহাদেশ বর্তমান ছিলো। মধ্য অরডোভিসিয়ান সময়ে সম্ভবত অনেকগুলি ছোট ছোট ভূখণ্ড ছিলো।

মহাদেশগুলির অপসৃতির ফলে পৃথিবীতে সাধারণত দু রকমের আবহাওয়া দেখা যায়। যখন বিশাল ভূখণ্ডগুলি একত্রে জুড়ে একটা বৃহত্তম ভূখণ্ড তৈরী হয় তখন সেই বৃহত্তম ভূখণ্ডে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় তাকে বলে মহাদেশীয় আবহাওয়া। তাতে আবহাওয়ায় নানা ঋতুগত পরিবর্তন হয়। কোথাও প্রচুর বৃষ্টিপাত, কোথাও তীব্র গরম, কোথাও তীব্র শীত। যেমন—ভারতবর্ষ। এই নাটকীয় ঋতু বৈচিত্র্যের জন্য মহাদেশে বিভিন্ন ঋতুতে খাদ্যেরও রকমফের ঘটে।

আবার যে সমস্ত ভূখণ্ড তুলনামূলক ভাবে ছোট ও সমুদ্রবেষ্টিত সেখানকার আবহাওয়াকে সামুদ্রিক আবহাওয়া বলে। যেমন ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ। তাপমাত্রা ও খাদ্যসম্ভার প্রায় একই রকম থাকে বলে এসব জায়গায় প্রাণিকুলের জীবনযাত্রার একটা স্থায়িত্ব থাকে।

যখন আবহাওয়া থাকে মহাদেশীয় তখন কখনও খাবারের প্রাচুর্য থাকে আবার কোথাও কখনও খাবারের অভাব থাকে। ফলত প্রাণিকুলকে এসব খাবারের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে থাকলে চলে না। বরং সামুদ্রিক ভূমির ধারে কাছের ঋদ্ধ জৈবিক স্তর (Rich Organic Layer) থেকে খাবার খুঁজে নেওয়া ভালো। কাজেই সে সময় 'Deposit feeder' জাতীয় প্রাণীর সংখ্যাবৃদ্ধি হয়। প্রি-ক্যামব্রিয়ান মহাযুগে এরকমই ঘটেছিল। সে সময় এই 'Deposit feeder'-রা সমগ্র পৃথিবীর সমুদ্রধার-গুলিতে বিস্তৃত ছিলো। ক্যামব্রিয়ান যুগে মহাদেশ ভাঙতে শুরু করলে আবহাওয়াও সামুদ্রিক হতে শুরু করে এবং জীবজগৎ বিবর্তিত হয়। এমন জীবন পৃথিবীতে দেখা দিতে শুরু করে যারা মাটির উপরিতল থেকে খেতে অভ্যস্ত। ক্যামব্রিয়ান 'ফনা'গুলি ছিলো কাদায় মুখ ঢুকিয়ে খাওয়া আরথ্রোপড—ট্রাইবোলাইট। ছিলো স্পঞ্জ, ব্রকিয়াপড ইত্যাদি।

যাহোক, এভাবে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেই। কারণ আমাদের এই নিবন্ধের উদ্দেশ্যও তা নয়। আমাদের মূল বক্তব্য হলো মহাদেশীয় অপসৃতি, প্রাণিজগতের সৃষ্টি, উৎপত্তি, লয়, বিবর্তন ইত্যাদির অন্যতম প্রধান কারণ। কিভাবে এই বিবর্তন সংঘটিত হয়েছিলো তা বিশদ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। আজ থেকে ২০ কোটি বছর আগে সমস্ত মহাদেশগুলি একত্রিত অবস্থায় ছিলো। এই সময়কার একত্রীভূত মহাদেশকে বলা হয় প্যানজিয়া। পরে প্যানজিয়া উত্তর ও দক্ষিণ দুটি মহাদেশে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। উত্তর আমেরিকা ও ভারত ছাড়া ইউরেশিয়া নিয়ে উত্তরের মহাদেশ বা লরেশিয়া আর দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও আণ্টার্কটিকা নিয়ে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড

বা দক্ষিণ মহাদেশ। দুয়ের মধ্যে সমুদ্র ঢুকে পড়ে, টেথিসসাগর, যার অংশবিশেষ এখন ভূমধ্যসাগর। প্রায় ১০ কোটি বছর আগে মহাদেশগুলি ভেঙ্গে যেতে শুরু করেছে এবং প্রায় চল্লিশ হাজার বছর আগে পৃথিবী বর্তমান রূপ পেয়েছে। তবে সারাক্ষণই চলছে এই মহাদেশীয় অপসৃতির ক্রিয়া। ভবিষ্যতে কীরূপ ধারণ করবে আমাদের পৃথিবী কে জানে?

তুষার যুগ

প্রাণিজগতের বিবর্তনে আরো একটি ঘটনা অসম্ভব প্রভাব বিস্তার করেছে। তা হলো তুষার যুগের আগমন ও নির্গমন। অতীতে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ বারবার তুষারের আচ্ছাদনে আবৃত হয়েছে। ফলে মেরুপ্রদেশ অনেক বেড়ে গেছে এবং সমুদ্র-পৃষ্ঠের জলতল অনেক নেমে গেছে। এই রকম ঘটনাকেই তুষার যুগ বলা হয়। আবার কালক্রমে তুষারের আচ্ছাদন সরে গেছে, মেরুঅঞ্চল সংকুচিত হয়েছে ও তুষার গলে সমুদ্রের জলতল অনেক গভীর হয়েছে। বারবার এই তুষারের আচ্ছাদন ও পশ্চাদপসরণের ফলে অনেক প্রাণী ধ্বংস হয়েছে, অনেক প্রাণীর বিবর্তন ঘটেছে ও অনেক নতুন প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। কেবলমাত্র কেনোজোয়িক মহাযুগের মধ্যেই গত ১০ লক্ষ বছরের মধ্যে চারটি তুষার যুগ ঘটে গেছে। এই চারটি প্রধান তুষার যুগের নাম—(১) গুন্‌জ্‌, (২) মিন্‌ডেল (৩) রিস ও (৪) উয়র্ম। এছাড়াও অবশ্য প্রবল শৈত্য ও তাপমাত্রার অবনমন লক্ষিত হয়েছে বেশ কয়েকবার কিন্তু সেগুলি তুষার যুগ আখ্যা পায়নি। অবশ্য কেনোজোয়িকের আগেও তুষার যুগ অন্তত আরো চারবার এসেছে বলে মনে করেন বৈজ্ঞানিকেরা। এর মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো হুরনিয়ান তুষার যুগ যা আসে প্রায় ২৪০ কোটি বছর আগে এবং যা প্রায় ২০ কোটি বছর স্থায়ী ছিল। এইসব তুষার যুগের সময়ে জীবনের বৈচিত্র্যও ছিলো যথেষ্ট ও তার উপরে তুষার যুগের প্রভাবও পড়েছিল।

দুটি তুষার যুগের মধ্যবর্তী কালকে বলা হয় অন্তর্বর্তী তুষার যুগ (Interglacial)। চার্ট নং—২ক ও ২খ থেকে তুষার যুগ ও অন্তর্বর্তী তুষার যুগের বিস্তৃতির একটা ধারণা পাওয়া যায়।

চার্ট—২ক

মিলিয়ন বছরের হিসাবে (১০⁶ বছর)	তুষার যুগ — উচ্চ প্লিসটোসিনের আগে (প্লিসটোসিনের শেষ পর্যায়ের আগে)
০·২	উচ্চ প্লিস্‌টোসিন
০·৩, ০·৪	মিনডেল—রিস্‌ অন্তর্বর্তী তুষার যুগ
	মিনডেল
০·৫	গুন্‌জ্‌—মিনডেল অন্তর্বর্তী তুষার যুগ
০·৬	গুন্‌জ্‌
০·৭	ডোনাও—গুন্‌জ্‌ অন্তর্বর্তী তুষার যুগ
০·৮	ডোনাও তুষার যুগ
০·৯	
২·০	

চার্ট—২খ

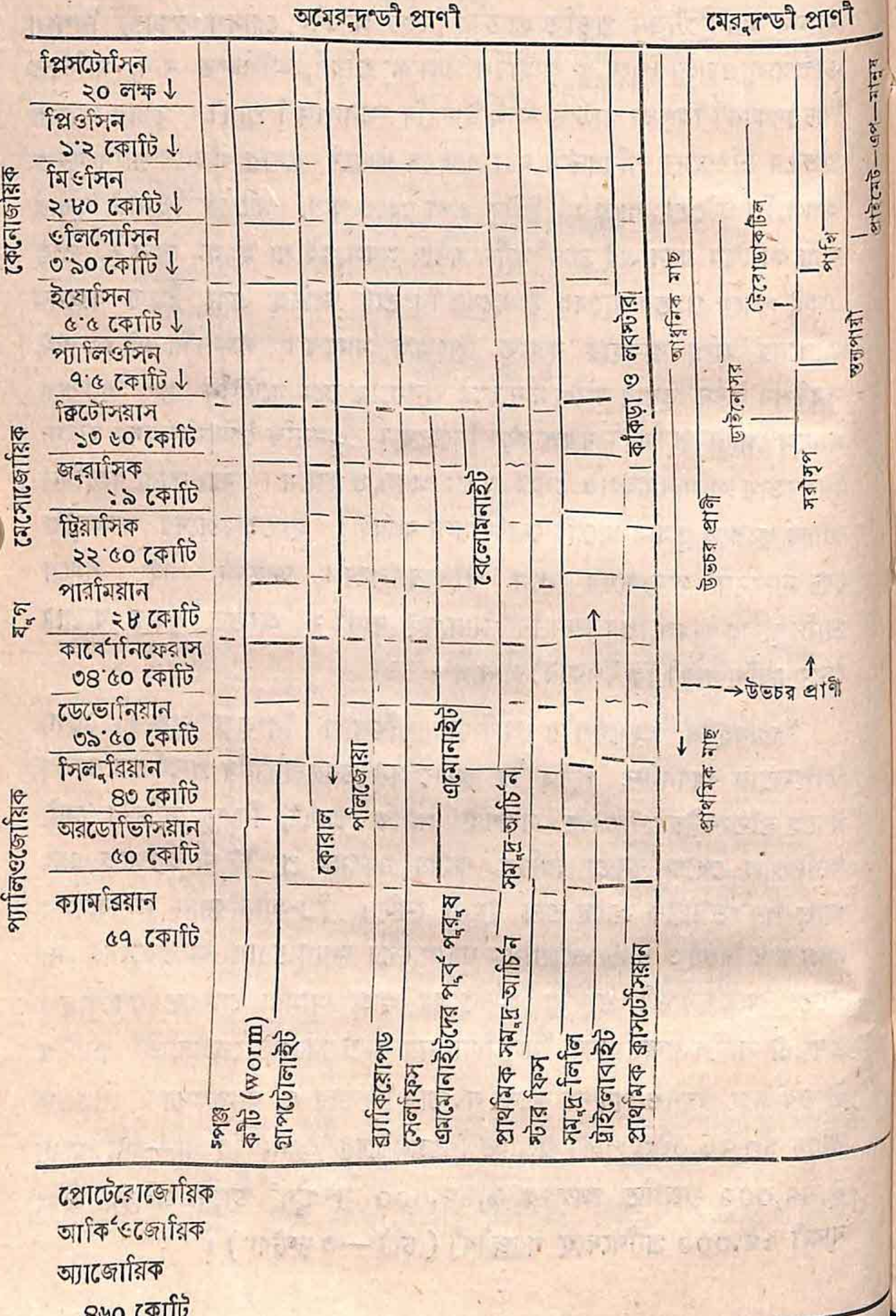
এখন থেকে হাজার বছরের হিসাবে (১০³ বছর)	তুষার যুগ	উচ্চ প্লিসটোসিন বা প্লিসটোসিনের শেষ পর্যায় ও আধুনিক
১০	তুষার যুগের পরবর্তীকাল ↑	
২০	উয়র্ম—রাইন	
৩০	উয়র্ম	নীচু পর্যায়
৭০		মধ্য পর্যায়
৮০	উয়র্ম	
১১০	(সর্বশেষ তুষার যুগ)	উচ্চ পর্যায়
১২০	রিস্—উয়র্ম	সর্বশেষ অন্তর্বর্তী
১৮০	(great interglacial)	তুষার যুগ
১৯০		শেষ তুষার যুগের আগের তুষার যুগ
২৩০	রিস্	উচ্চ প্লিসটোসিন ↑
	↓	

প্রাণী বিলোপের সঙ্গে তুষার যুগের সম্পর্ক নিয়ে সম্প্রতি অনেক আলোচনা হয়েছে। বিশেষত প্লিস্টোসিনের শেষদিকে যখন উয়র্ম তুষার যুগ চলছে সেই সময় অনেক প্রাণীরই অবলুপ্তি ঘটেছে ; যেমন

ম্যামথ, ম্যাস্টোডন প্রভৃতি হাতীর নিকট আত্মীয়, রোমশ গণ্ডার, বিশাল ডালপালাওয়ালা শিংযুক্ত আইরিশ এল্ক্ হরিণ, অসিদন্ত বাঘ, মাটিতে বিচরণকারী বিশাল গ্রাউণ্ড শ্লথ ইত্যাদি স্তন্যপায়ী প্রাণী। তুষার যুগের প্রভাবে উদ্ভিদের পরিবর্তন ঘটা এবং সে কারণে খাদ্যের অভাবে প্রাণিকুলের অবলুপ্তি ঘটতেই পারে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, আগের তিনটি তুষার যুগ কাটিয়ে এসে এই প্রাণীগুলি হঠাৎ অবলুপ্তই বা হলো কেন? প্রায় একই সময়ে প্রস্তর যুগের মানুষের বিস্তার ঘটেছে এবং উন্নত ধরনের পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করতে শিখেছে মানুষ। লক্ষণীয় এই যে এই সর্বশেষ উয়র্ম তুষার যুগে মানুষের অবলুপ্তি তো ঘটেইনি বরং এরপরে মানুষ গোটা পৃথিবী দখল করে নিয়েছে! এমনকি বৈজ্ঞানিকদের ধারণা নিয়নডার্থাল মানুষেরাও তুষার যুগে অবলুপ্ত হয়নি। বরং তারা বহুদিন রাজত্ব করেছে তুষার যুগের মোকাবিলা করেই। হয়তো তাদের অবলুপ্তি ক্রো-ম্যাগনন মানুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা। তাহলে এই সময়ে প্রাণিকুলের অবলুপ্তির জন্য কি মানুষই দায়ী? অন্তত তুষার যুগের চেয়ে বেশি দায়ী কি শিকারী মানুষ?

বিরামহীন মহাদেশীয় অপসৃতি, বিপুল বিস্তৃত তুয়ার যুগ, তাপমাত্রার অবনমন, পৃথিবীর ক্রমশ ঘনীভবন ইত্যাদি প্রাকৃতিক বলের কাছে নতিস্বীকার করেছে অবশ্যই অনেক প্রাণী, কিন্তু সৃষ্টির সেই আদিকাল থেকে কতো বিচিত্র, কতো রকমের প্রাণীই না জন্মেছে এবং আজ পর্যন্ত টিকে আছে তার ইয়ত্তা নেই। প্রি-ক্যামব্রিয়ান মহাযুগের কথা বাদ দিলেও প্যালিওজোয়িক মহাযুগের ক্যামব্রিয়ান অন্তর্যুগেই না কতো অমেরুদণ্ডী প্রাণীর অস্তিত্বের কথা আমরা জানতে পেরেছি। এবং ঐ প্যালিওজোয়িকের সিলুরিয়ানের সময় থেকেই মেরুদণ্ডী প্রাণীর উদ্ভব এবং এখনও পর্যন্ত কতো না তার বিস্তার ও ব্যাপকতা। ১৯৬৮ সালে ১০,৭১,০০০ প্রাণী প্রজাতি বিজ্ঞানীদের জানা ছিলো—এর মধ্যে ৮,৪৭,০০০ প্রজাতি স্থলচর ১,৬৭,০০০ সম্পূর্ণ ভাবে জলচর এবং বাকী ৫৭,০০০ প্রাণিদেহে পরজীবী (চার্ট—৩ দ্রষ্টব্য)।

চার্ট—৩



অমেরুদণ্ডী প্রাণী
মেরুদণ্ডী প্রাণী
কেনোজোয়িক
মেসোজোয়িক
যুগ
প্যালিওজোয়িক
প্লিসটোসিন
২০ লক্ষ ↓
প্লিওসিন
১'২ কোটি ↓
মিওসিন
২'৮০ কোটি ↓
ওলিগোসিন
৩'৯০ কোটি ↓
ইয়োসিন
৫'৫ কোটি ↓
প্যালিওসিন
৭'৫ কোটি ↓
ক্রিটেসিয়াস
১৩'৬০ কোটি
জুরাসিক
১'৯ কোটি
ট্রিয়াসিক
২২'৫০ কোটি
পারমিয়ান
২৮ কোটি
কার্বোনিফেরাস
৩৪'৫০ কোটি
ডেভোনিয়ান
৩৯'৫০ কোটি
সিলুরিয়ান
৪৩ কোটি
অরডোভিসিয়ান
৫০ কোটি
ক্যামব্রিয়ান
৫৭ কোটি
স্পঞ্জ
কীট (worm)
গ্রাপটোলাইট
কোরাল
পলিজোয়া
ব্র্যাকিয়োপড
সেলফিস
এমোনাইটদের পূর্ব পুরুষ
এমোনাইট
বেলেমনাইট
প্রাথমিক সমুদ্র-আর্চিন
সমুদ্র-আর্চিন
স্টার ফিস
সমুদ্র-লিলি
ট্রাইলোবাইট
কাঁকড়া ও লবস্টার
প্রাথমিক ক্রাসটেসিয়ান
প্রাথমিক মাছ
আধুনিক মাছ
উভচর প্রাণী
→উভচর প্রাণী
সরীসৃপ
ডাইনোসর
টেরোডাকটিল
পাখি
স্তন্যপায়ী
প্রাইমেট—এপ—মানুষ
প্রোটেরোজোয়িক
আর্কিওজোয়িক
অ্যাজোয়িক
৪৬০ কোটি

প্যালিওজোয়িকে ক্যামব্রিয়ান অন্তর্যুগেই আমরা স্পঞ্জ, কীট, গ্রাপটোলাইট, ব্রাকিয়াপড, সেলফিস, এমমোনাইটদের পূর্বপুরুষ, প্রাথমিক সামুদ্রিক-আর্চিন, স্টার ফিস্, সমুদ্র-লিলি, ট্রাইলোবাইট্, প্রাথমিক ক্রাসটেসিয়ান ইত্যাদি প্রাণিকুলের সাক্ষাৎ পাই। এদের মধ্যে স্পঞ্জ, কীট, ব্রাকিয়াপড, সমুদ্র-আর্চিন, সমুদ্র-লিলি, ক্রাসটেসিয়ানদের মধ্যে কাঁকড়া ও চিংড়ি সব ঘাত-প্রতিঘাত পার হয়ে এখনও আছে। গ্রাপটোলাইটরা ছিলো সিলুরিয়ানের শেষ পর্যন্ত। সেলফিসরা ইয়োসিন যুগেও বর্তমান ছিলো। ট্রাইলোবাইটরা কার্বনিফেরাস পার হয়ে এসেছিল। এমমোনাইটরা মেসোজোয়িক যুগের শেষ পর্যন্ত বর্তমান ছিলো। অরডোভিসিয়ানে কোরাল সৃষ্ট হয়ে এখনও আছে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে প্রাথমিক মাছেরা হয়তো নেই কিন্তু রূপান্তরিত, বিবর্তিত হয়ে মাছেরা অদ্যাবধি বর্তমান। একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে অবশ্য ডাইনোসর এবং পাখিদের পূর্বপুরুষ টেরোডাকিল। টেরোডোকটিল যদিও পাখিতে বিবর্তিত বলা যায় তবে সরীসৃপদের মধ্যে মেসোজোয়িকে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে রাজত্ব করতো যে ডাইনোসরেরা তারা অবশ্যই অবলুপ্ত। ডাইনোসরেরা যখন পৃথিবীতে ছিলো, তখন কোনো মানুষ ছিলো না পৃথিবীতে। তাই ডাইনোসরেরা স্বাভাবিক প্রকৃতিগত কারণেই বিবর্তনের অযোগ্যতার জন্যই হয়তো অবলুপ্ত। তবে অধিকাংশ প্রাণিকুলই নানা প্রকারে বিবর্তিত হয়েও টিকে আছে বা বহুদিন পর্যন্ত ছিলো। তাই স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে যে মানুষের শিকার স্পৃহা ও জীবিকার প্রয়োজনে শিকারের জন্যই হয়তো অনেক প্রাণী অবলুপ্ত, যেমন অবলুপ্ত হয়েছে ম্যামথ, ম্যাসটোডন, রোমশ গণ্ডার, আইরিশ এল্ক্, অসিদন্ত বাঘ ইত্যাদি নানা ধরনের প্রাণী।

মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম হোমো স্যাপিয়েন্স্। আক্ষরিক অর্থ হলো বিজ্ঞমানুষ। বৈজ্ঞানিকেরা প্রাণিজগতের নানাভাবে নামকরণ করেছেন কাজের ও গবেষণার সুবিধার্থে। এই প্রথার নাম Taxonomy। ট্যাক্সোনমির আলোচনায় যাবার আমাদের অবকাশ নেই। শুধু এটুকু

বললেই যথেষ্ট হবে যে প্রাণীরাজ্যকে কয়েকটি পর্বে Phylum) ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি পর্বকে কয়েকটি শ্রেণীতে (Class)। শ্রেণীকে ভাগ করা হয়েছে বর্গে (Order)। বর্গকে ভাগ করা হয়েছে 'গোত্রে' (Family)। গোত্রকে, গণে (Genus) এবং গণকে প্রজাতিতে (Species)। হোমো স্যাপিয়েন্স বলতে আমরা বুঝবো 'হোমো'-গণ এবং 'স্যাপিয়েন্স'-প্রজাতি। 'হোমো'গণের মধ্যে 'হোমো হ্যাবিলিস' এবং 'হোমো ইরেকটাস' আজ বিলুপ্ত। হোমো স্যাপিয়েন্‌স্‌দের মধ্যে নিয়নডার্থাল বিলুপ্ত। ক্রো-ম্যাগনন মানুষেরাও হোমো স্যাপিয়েন্‌স্‌। আধুনিক মানুষ 'হোমো স্যাপিয়েন্‌স্‌ স্যাপিয়েন্‌স্‌'। ৩০ লক্ষ বছর আগে কোনো 'হোমো'গণের অস্তিত্বের প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। হোমো-ইরেকটাসের ফসিল এখনও পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে তা ১৬ লক্ষ বছর আগের মাত্র। আধুনিক মানুষ 'হোমো স্যাপিয়েন্স' মাত্র ৫ লক্ষ বছর আগে এবং একেবারে আধুনিক মানুষ কেবলমাত্র পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। আগেও মাংসভুক প্রাণীরা প্রাণিহত্যা করতো। তা তাদের জীবিকার প্রয়োজনে এবং এতে কোনো প্রজাতি অসম্ভব বংশবৃদ্ধি করে বেড়ে উঠে ক্রমশঃ ক্ষয়ে যেতে পারতো না। প্রকৃতি একটা সমতা নির্ধারণ করে রাখতেন নিজে নিজেই। কিন্তু মানুষ জীবিকার প্রয়োজন ছাড়াও হত্যা করে। শিকার করে অনেক সময় আনন্দের জন্যই, হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যই। কাজেই মানুষের এই প্রবৃত্তি যে অনেক প্রাণীর বিলোপের কারণ হতে পারে না তা নয়। অন্যান্য কারণের চেয়ে এটাও একটা প্রধানতম কারণ হয়ে উঠতে পারে।

আদিম শিকারী মানুষ

আদিম মানুষদের বা 'হোমো'গণের রীতিই ছিলো পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করে বা নতুন নতুন পাথরের অস্ত্র তৈরী করে শিকার সংগ্রহ করা, জীবিকা নির্বাহ করা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। যদিও তারা প্রায় সর্বভুক ছিলো, তবুও তারা ছিলো মূলত

মাংসাশী। নিকট আত্মীয় গ্রেট এপরা যদিও হয়তো মাঝে মাঝে মাংস খেতো তবুও তারা ছিলো প্রধানত নিরামিশাষী। পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষেরা বা মনুষ্যজাতীয় হোমো-গণ ছিল বিশেষভাবে মাংসভুক (Predator)। কোনো পশুপালন তারা করতো না, কোনো শাকসব্জি বা ফসলের চাষাবাদও করতো না। কেবল নির্ভর করতো সেটুকুর ওপর যা বন্যপ্রকৃতির কাছ থেকে স্বাভাবিকভাবে সংগ্রহ করা যায় (মাঝে মাঝে অস্ত্রের সাহায্যে)। বড় বড় দলে বিভক্ত হয়ে তারা একটা এলাকাজুড়ে থাকতো। শিকার সংগ্রহ করতো বয়স্ক ও যুবকেরা। মহিলারা হয়তো সংগ্রহ করতো খাবার। এলাকায় খাবার কমে গেলে তারা অন্য এলাকায় চলে যেতো। তবু এইসব শিকারী মানুষদের একটা গৃহভিত্তির প্রয়োজন দেখা গেছিল। অন্তত শিম্পাঞ্জীদের বাসার চেয়ে সেই গৃহভিত্তি স্থায়ী ও মজবুত হতো। দৈনন্দিন জীবনে ক্রমশ আরো অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে থাকলো। বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র তৈরী করার প্রয়োজন হতে থাকলো। সুতরাং প্রাথমিকভাবে মানুষের সঙ্গে প্রাণিজগতের সম্বন্ধ অস্ত্রেরই সম্বন্ধ। আফ্রিকা মহাদেশে, এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় নানা অস্ত্র শিল্পের কারখানাও আবিষ্কৃত হয়েছে। বড়, মাঝারি, ছোট পাথরকে একদিকে বা দুদিকে আঘাত করে চপারের মতো তৈরী করা হতো। ঐ পাথর থেকেই আঘাতের ফলে বের হয়ে আসতো শক্ত ফলক (Flake) এবং সুচোলো টুকরো (Flint)। মধ্য প্লিসটোসিনে হাত-কুঠার ব্যবহৃত হতে আরম্ভ হয়েছিল। সে সময় Chert ও Quartzite থেকেও তৈরী অস্ত্র ব্যবহৃত হতো। হাঙ্গেরীর ভারতেশজোলোসে প্রাণীদের হাড়ের সঙ্গে এরকম অস্ত্রশস্ত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতেশজোলোসে ঝলসানো প্রাণীর হাড়ের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে বা উত্তর চীনের পূর্বদিকের গুহাতে এরকম চিহ্ন পাওয়া গেছে। পিকিং মানুষেরা (হোমো ইরেকটাস) প্রাণিহত্যা ক'রে জীবনযাপনে বেশ কৃতকার্য হয়ে উঠেছিল। তারা সাধারণত মৃগশিকারের উপর নির্ভরশীল ছিল। তবে হাতি ঘোড়া, গণ্ডার, বাইসন, জলমহিষ, উট, বন্যবরাহ, এনটিলোপ, ভেড়া সবই শিকার করতো। এমনকি অসিদন্ত বাঘ, চিতা, গুহাভল্লুক এবং বড় হায়েনাও

মারতো। প্রস্তরযুগের কালসীমা বিপুল বিস্তৃত। হোমো-ইরেকটাসেরা তো আগুন জ্বালাতে শিখলো এবং আদিবাসভূমি আফ্রিকা থেকে বের হয়ে ইউরোপ এশিয়াতেও ছড়িয়ে পড়লো। তার আগের থেকেও অর্থাৎ হোমো হ্যাবিলিস্‌দের সময় থেকেই অর্থাৎ ১৬ লক্ষ বছরের আগেও, ধরা যাক ৩০ লক্ষ বছর আগের থেকে ৮।১০ হাজার বছর আগে পর্যন্ত এই প্রস্তর যুগ বিস্তৃত। এই বিশাল সময় সীমায় কীভাবে অস্ত্রশস্ত্র উন্নত থেকে উন্নততর হয়েছে, কীভাবে মানুষের কারিগরী মেধা বেড়ে গেছে, কতো জায়গায় অস্ত্র শিল্পের কারখানা পাওয়া গেছে হোমো স্যাপিয়ান্‌স্‌ নিয়ানডারথালিস্‌ এবং ক্রো-ম্যাগননদের সময় পর্যন্ত, তার ইতিহাস অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ, চিত্তাকর্ষক। এই স্বল্প পরিসরে আলোচনা সম্ভবও নয়। শুধু উল্লেখ করতে হবে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বা টেম্‌স্‌, নীল, ভাল, জামবেজি, নর্মদাবেসিনে, পূর্ব আফ্রিকা বা আলজিরিয়ার লেক অঞ্চলে, স্পেন বা ইংল্যাণ্ডের লেক অঞ্চলেও এতো বেশি প্রাণীর হাড় পাওয়া গেছে যে প্রাণী হত্যাই মানুষের প্রধান জীবিকা ছিলো সন্দেহ নেই। বেবুন, Giant Pig, বড় ঘোড়া, হিপ্‌পোপটেমাস, হাতী, গণ্ডার, মহিষ, জেব্রা, জিরাফ, ওয়ার্টহগ্‌, গেজেল ইত্যাদি প্রাণীর হাড় পাওয়া গেছে। পিকিং মানুষদের আবাসস্থল —চৌকৌতিয়েনের কথা আগেই বলা হয়েছে। লেভান্ত, ইরাক, ইরান, পশ্চিম এশিয়া সর্বত্রই অস্ত্র ব্যবহৃত হতো। প্রাণিহত্যা মনুষ্যজাতীয়দের প্রধান অবলম্বন ছিলো সন্দেহ নেই কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না, কী প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে তারা নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতো পশুর মতো জীবনধারণ করে। নিয়নডার্থাল মানুষেরা অনেকাংশে সভ্য হয়ে উঠেছিল ঠিকই। তাদের কবরখানাও আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু তারা প্রচণ্ড তুষার যুগকে অতিক্রম করছিল একথা আমাদের মনে রাখতে হবে। ক্রো-ম্যাগনন মানুষেরা যদিও তুলনামূলকভাবে উষ্ণ আবহাওয়া পেয়েছিল তবু সে সময়কার বেঁচে থাকার জন্য প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু মানুষের স্বভাবের মধ্যে এই প্রাণী হত্যার স্পৃহা কতখানি মিশে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের সম্পর্ককে বিবর্তিত করেছে এটা অনুসন্ধানের বিষয় অবশ্যই।

নিওলিথ মানুষ

৮।১০ হাজার বছর আগে নিওলিথ সভ্যতার শুরু একটা প্রচন্ড বিপ্লবের সমতুল্য। নিওলিথ সভ্যতা প্রকৃতপক্ষে শিকারীর স্তর থেকে মানুষের প্রধানত কৃষি ও পশুপালনে উত্তরণের ইতিহাস। এই ইতিহাসের ফলশ্রুতি হিসাবেই এসেছিলো মানুষের সভ্যতার বিবর্তন। কৃষি ও পশুপালনের জন্য মানুষকে এক জায়গায় থাকতে হলো, অনিবার্যভাবে জটিল সমাজব্যবস্থাও কৃষি, গোপালনভিত্তিক অর্থনীতির সামিল হতে হলো। এই নিওলিথ বিপ্লবের প্রধান পটভূমিকাই হলো মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর সম্পর্কের বিবর্তন। অর্থাৎ শিকারী থেকে পশুপালক ও কৃষক। যুবকেরা শিকার করতো বটে, কিন্তু মেয়েরা ও বয়স্ক মানুষেরা সংগ্রহ করতো পরিপূরক খাবার শিশু ও কিশোরদের প্রতিপালনের জন্য। যেমন শাকসব্জি, ফলমূল, ডিম, পোকামাকড়, সেলফিস ইত্যাদি। সেজন্য গৃহভিত্তিও গড়ে উঠেছিল। শিকারের বিপদ ও ঝুঁকির কথাও মনে রাখতে হতো। সর্বদা অত্যন্ত ভয়ে ভয়েই তাদের জীবনযাপন করতে হতো এবং এই ভয় থেকেই জন্ম নিয়েছিল নানান সংস্কার ও সাহস—যা আমাদের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। গুহাচিত্র থেকে এটাও মনে করা যেতে পারে যে, যদি বেশ কিছু দিনের জন্য খাবার সংগ্রহ হতো, তাহলে তাদের হাতে থাকতো সময় এবং এ সময় তারা বিপদের মুখে বের হতে চাইতো না। তখনই তারা শিল্পের দিকে মনোযোগী হতো। গুহাচিত্রই তার প্রমাণ। এই গুহাচিত্রগুলি অবশ্য তাদের সংস্কার ও অবচেতনসঞ্জাত। এইসব প্রাণীদের চিত্র ও শিকারচিত্র থেকে বোঝা যায় তারা হয়তো কোনো অনুষ্ঠানের মতো করে পরবর্তী শিকারের জন্য কৃতকার্যতা ভিক্ষা করতো কোনো অজ্ঞাত শক্তির কাছে। এটাই সংস্কার। শিকারের দ্বারা জীবনযাপন অবশ্য ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করে। কিন্তু কৃষি ও পশুপালন ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে খুলে দেয়। তাই ক্রমশ মানুষ কৃষি ও পশুপালনে সরে আসছিল। যে প্রথায় বহু লোক একত্রে থাকতে পারে স্থায়ী বাসস্থানে, যে প্রথায় আরো জটিল সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যে প্রথায় নতুন নতুন কারিগরী বিদ্যার স্ফুরণ হয়, ধন বৈষম্য গড়ে ওঠে, সে প্রথার ভিত্তিই হলো সীমিত এলাকা থেকে স্থায়ীভাবে খাদ্যোৎপাদন এবং পশুপালন। আবার এই খাদ্যোৎপাদন ব্যবস্থা ও পশুপালন বা প্রাণী

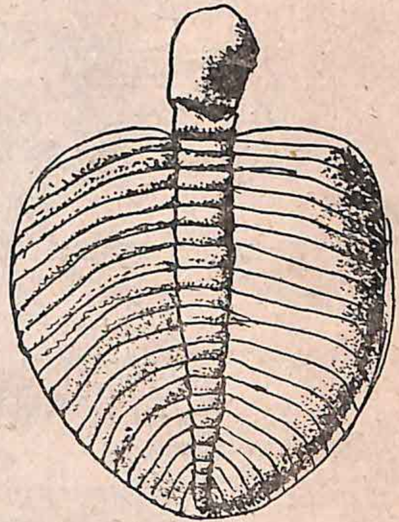
পালন থেকেই আরো নানা রকমের সংস্কার জন্ম নেয়। বস্তুতপক্ষে মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদের সম্পর্কের পরিবর্তন নিওলিথের আগেই শুরু হয়েছিল ক্রমশ খুব ধীরগতিতে। এই পরিবর্তনের ফলশ্রুতিই হয়তো নিওলিথ সভ্যতার সূত্রপাত। মানুষ আগে যে জীবন ধারণের শক্তিটা সঞ্চয় করতো তা প্রাণিদেহ থেকে। ঐসব প্রাণীরা আবার সঞ্চয় করতো অন্য প্রাণীদের থেকে বা প্রধানত উদ্ভিদ থেকে। উদ্ভিদরা সঞ্চয় করতো সালোক-সংশ্লেষের মাধ্যমে আলোক থেকে। এই সময় থেকেই মানুষ সংগৃহীত শক্তির খানিকটা অংশ উদ্ভিদের কাছ থেকে এবং খানিকটা পূর্ব প্রথামত প্রাণি দেহ থেকে গ্রহণ করতে শিখলো। প্রাণীদের গৃহপালিত করা হতে থাকলো প্রাথমিক ভাবে মমতা-বশত হয়তো নয়, খাদ্য হিসাবে। পরে তাদের কৃষিতেও ব্যবহার করা হয়েছিল প্রয়োজনের তাগিদে। মেক্সিকো ভ্যালিতে পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার থেকে বোঝা যায় গৃহপালিত প্রাণীরা প্রথমদিকে অত্যন্ত 'মাইনরিটি' ছিলো। প্রাথমিক কৃষক শিকারী মানুষেরা যেসব প্রাণী ও উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল ছিলো জীবনধারণের জন্য, তা সবই ছিলো বন্য। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর, বিশেষ করে লেভান্ত, বা দক্ষিণ আনাতোলিয়ার উপকূলভাগে বেশ কিছুদিন পরে 'সিরিল' (Cereal) উৎপাদনকারী কৃষক সমাজ দেখা গেলো। প্যালেস্টাইন, জর্ডান এলাকায় একদিকে কৃষি উৎপাদন যেমন দেখা যেতে থাকলো, তেমনি মানুষের খাদ্য-তালিকায় গবাদি পশু, ছাগল জাতীয় প্রাণীর মাংসও বর্তমান ছিলো। জাগ্রোস এলাকায় প্রাধান্য ছিলো ভেড়ার।

আমরা এভাবেই ধীরে, খুব ধীরে, ইউফ্রেটিস টাইগ্রিস এলাকায় বা ইজিপ্টে প্রাথমিক সভ্যতায় পদার্পণ করি এবং মানুষের সঙ্গে প্রাণীদের ও উদ্ভিদের সম্পর্কও একটা দৃঢ়ভূমিতে পদার্পণ করে। এর অণুপুঙ্খ বিবরণ, ভূতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ভিত্তিতে অন্য বইয়ের বিষয়।

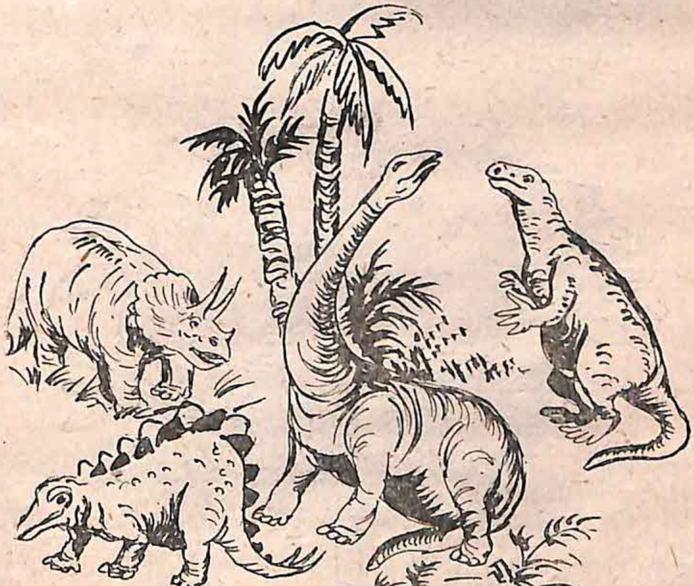
মানুষ, প্রাণী ও সংস্কার সম্পর্কে মূল আলোচনার পটভূমি সৃষ্টির জন্য এই সংক্ষিপ্ত কথাগুলির অবতারণার প্রয়োজন ছিলো বলেই—এই আদিকথা।



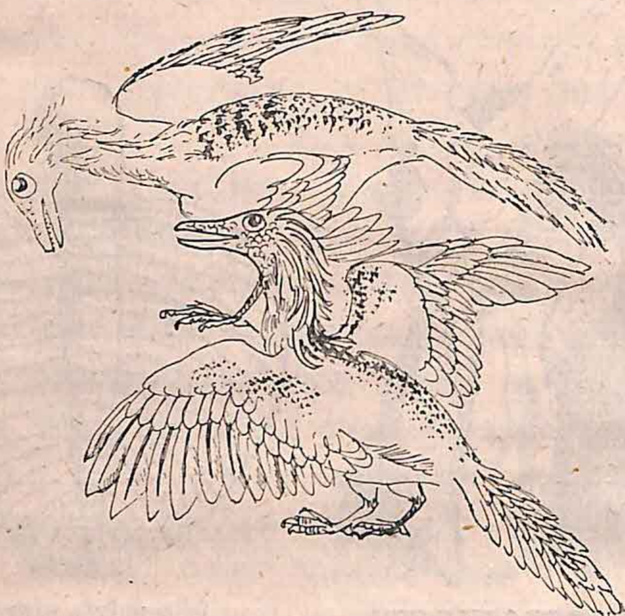
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বুনো মোরগের
বংশধর ফরাসী মোরগ



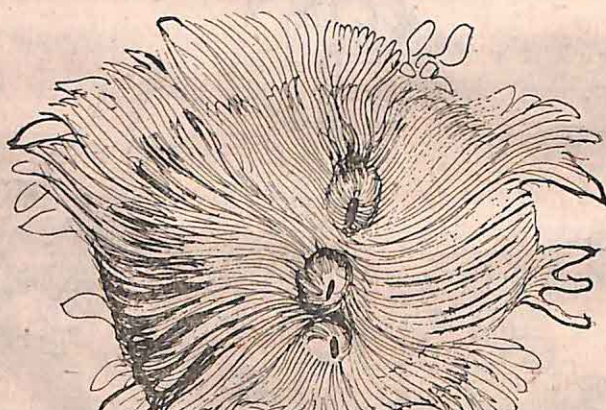
ট্রাইলোবাইটের ফসিল



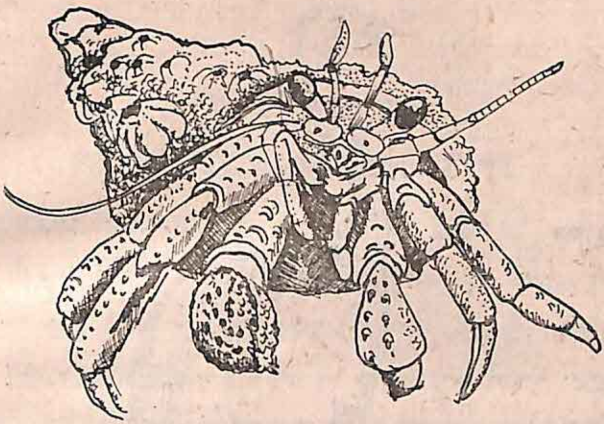
ডাইনোসরের জ্ঞাতি (বিলুপ্ত)



১৩০ মিলিয়ন বছর আগের আরকিওপটেরিক্স (বিলুপ্ত)



কোরাল



সন্ন্যাসী কাঁকড়া



প্রথম উভচর ইকথিওস্টেগা (বিলুপ্ত)



বিভার



২০০০ বছর আগের মোয়া পাখি (বিলুপ্ত)



হো মো ইরেকটাস মানুষ (আগুনের ব্যবহার ও পাথরের অস্ত্র তৈরী করতো—বিলুপ্ত)

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাণিজগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক

(ক) শিকার ও সংস্কার : 'শিকার ও সংস্কার' বললে হয়তো ভুল হয়। ঠিক হতো, "শিকার, সংস্কার ও শিল্প" বললে। আসলে শিকারের সঙ্গে সঙ্গে যেমন সংস্কার জন্ম নিয়েছে, তেমনি জন্ম নিয়েছে শিল্পও। শিল্পী মানুষ সংস্কারবদ্ধ। সংস্কার ও শিল্প অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলো, অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ে। এ সম্পর্কে প্রথম আবিষ্কারের গল্পটি যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি বিষাদময়। আবিষ্কার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আকস্মিক, বিশেষ করে যুগান্তকারী আবিষ্কার। স্পেনের উকিল ও এ্যামেচার পুরাতত্ত্ববিদ 'সাওতোলা'র (Sautaula) আবিষ্কারটি এই রকমই একটি আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের জন্য তিনি কোনো খ্যাতি তো পাননি, উল্টে বিদ্রুপের কশাঘাতে জর্জরিত হয়েছিলেন। তঞ্চকতা ও প্রতারণার অভিযোগ এনেছিলেন বৈজ্ঞানিকেরা তাঁর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের। তাঁর বাড়ির কাছাকাছি একটি পুরোনো গুহার মেঝেতে পুরোনো মানুষদের ব্যবহৃত পাথরের অস্ত্রশস্ত্রের ও প্রচুর হাড়ের অবশেষ দেখতে পান। একদিন তিনি তাঁর ছোট মেয়েকে নিয়ে গুহার ভেতরে যান। (মেয়েটি সম্ভবত বাবার সঙ্গে যাওয়ার জন্য বায়না ধরেছিল।) কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মেয়েটি গুহার ভেতরে আকর্ষণীয় কিছু না পেয়ে বিরক্ত হয়ে গুহার ভেতরেই চারদিক দেখতে থাকে। তার বাবা অবশ্য তখন মেঝেতে হাড় ও অস্ত্র খুঁজতে ব্যস্ত। হঠাৎ মেয়ের চীৎকারে সাওতোলার চমক ভাঙলো—'বাবা, দ্যাখো, দ্যাখো,—ষাঁড়!' মেয়ের দিকনির্দেশ অনুসরণ করে সাওতোলা গুহার সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। দেখলেন এবং চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। পঁচিশটি বিশাল বিশাল প্রাণীর ছবি গুহার সিলিং জুড়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এভাবেই আবিষ্কৃত হলো আলতামিরা গুহার ছবিগুলি। সমগ্র স্পেনে এই আবিষ্কারের কথা ছড়িয়ে পড়লো।

১৮৮০ সালে সাওতোলা এ নিয়ে একটি বই লিখলেন। দলে দলে মানুষেরা পুরোনো মানুষের আঁকা ছবিগুলি দেখতে এলো, এমনকি রাজাও এলেন। কিন্তু এলেন না বৈজ্ঞানিকেরা। তাঁরা সাওতোলার প্রতারণা সম্বন্ধে এতই নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, বললেন, প্রাগৈতিহাসিক লোকেরা ছবি আঁকছে একথা ভাবাই যায় না, তার ওপর আবার রঙীন। বৃথাই সাওতোলা তর্ক করতে থাকলেন। বিদ্রূপে বিদ্রূপে জর্জরিত হয়ে নয় বছর পরে তিনি দেহত্যাগ করলেন। তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে, লোকে আলতামিরার গুহাচিত্রের কথা এবং সাওতোলার কথা ভুলেই গেল। ছ-বছর পরে ব্যাপারটির আবার যবনিকা উত্তোলন হলো। তাঁর বিরুদ্ধবাদী বৈজ্ঞানিকেরা নিজেরাই আবার অন্য একটি গুহাতে এরকম রঙীন ছবি আবিষ্কার করলেন। কী আশ্চর্য, সাওতোলার বইয়ের ছবির সঙ্গে এই ছবিগুলির মিল তো অদ্ভুত! এই ছবিগুলিতে অবশ্য শুধু ষাঁড় নয়, ভালুক, হরিণ, এমনকি, এমন অনেক প্রাণীর ছবি ছিল যারা হাজার হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বাধ্য হয়ে তাঁরা আলতামিরা পাহাড়ে এলেন। সাওতোলার মেয়ের সঙ্গে দেখা করলেন। সেই ছোট্ট মেয়েটি ততদিনে অনেক বড় হয়ে গেছে। সে, প্রথম গুহার কাছে আরো অনেক গুহা ইতিমধ্যে আবিষ্কার করেছে, যেগুলিতে আরো শত শত ছবির সমারোহ। বাবার দুরবস্থা এবং মানসিক নির্যাতনের কথা ভেবে মেয়েটি তো কিছুতেই রাজী হয় না। কিন্তু বহু অনুরোধ উপরোধের পর সে এই ছবিগুলির খবর দিল।

দ্বিতীয় একটি গুহা, ক্ষেত্রফল প্রায় ৩০০ বর্গমিটার। সেখানে কম করে ১৫০টি প্রাণীর ছবি, সিলিংয়ে, দেওয়ালে। পরে আরো গুহা আবিষ্কৃত হলো। বেশ কিছু রঙীন। পরে দেখা গেছে, আদিম মানুষেরা ফেরিক-অক্সাইড ও ম্যাংগানিজ পারঅক্সাইড গুঁড়ো করে চর্বির সঙ্গে মিশিয়ে নানা ধরনের রঙ তৈরী করতো। বাইসন, হরিণ, ঘোড়া, ম্যামথ সব প্রাণীর ছবিই এঁকেছিল তারা।

এতক্ষণ ছবি আবিষ্কারের কথাই বলা হচ্ছে শিকার ও সংস্কারের

প্রসঙ্গে এসে। তার একটা কারণ আছে। বৈজ্ঞানিকেরা ছবিগুলির একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন। অধিকাংশ ছবির প্রাণীই হয় বিক্ষত, কিংবা মৃত অবস্থায় চিত্রিত কিংবা তাদের ছবির ওপরে ঝোলানো কুঠার বা পাথরের অন্যান্য অস্ত্র। এর মানে কি? পরবর্তীকালে এমন অনেক ছবিই আবিষ্কৃত হয়েছে যেখানে প্রকৃত শিকারের দৃশ্যই চিত্রিত। প্রাগৈতিহাসিক অস্ত্রধারী শিকারী মানুষের চিত্রও সেখানে আছে। অর্থাৎ আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, ছবিগুলি শিকারের বা শিকারের প্রতীক। এমন অনুমান করার সংগত কারণ আছে যে শিকারে যাবার আগে অনুষ্ঠানের মতো তারা এইসব পশুদের ছবি আঁকতো, প্রতীকগত ভাবে তাদের বিক্ষত করতো বা নিহত অবস্থায় ছবি আঁকতো যাতে তাদের শিকারের অভিযান কার্যকরী হয়। তখন শিকার করতে যাওয়া এবং শিকার করে নিহত পশু নিয়ে আসা ছিলো জীবনধারণের প্রয়োজনীয়তা, হিংসা নয়। শিকারে অকৃতকার্য হলে তাদের হয়তো খাওয়াই জুটতো না দীর্ঘদিন। সুতরাং খাদ্য হিসাবে এইসব পশুর দল তাদের কাছে প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে খাদ্যের থেকেও অধিকতর কিছু ছিলো। এদের শক্তির কাছেই প্রার্থনা জানাতো হয়তো এরা। হিংসা তো নয়ই, বরং সম্ভ্রম বা সম্মান—যা ক্রমশ এই পশুদেরই দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করেছিল। এই রকম অনুষ্ঠানগুলিই ক্রমশ সংস্কারে পরিণত হয়েছিল, জন্ম দিয়েছিল মিথের বা পুরাণ কথার। এরকম অনুমান করার আরো কারণ আছে, চিত্র ছাড়াও। যেমন, দক্ষিণ আফ্রিকার বুশম্যানেরা বা উত্তর আমেরিকার ইনডিয়ানরা এখনও শিকারে যাবার আগে নিজেরাই অ্যানটিলোপ সেজে বা বাইসন সেজে এক ধরনের নাচের অনুষ্ঠান করে, যাতে তারা শিকারে কৃতকার্য হতে পারে। উত্তর আমেরিকার ইনডিয়ানরা বাইসন সাজে, শিকারীরা ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে তাদের তাড়া করে আহত করে। বাইসন সাজা ব্যক্তিরা মৃতের ভান করে। তারপর তাদের কেটে ফেলার ভঙ্গি করা হয়। এই রকম সংস্কারজাত অনুষ্ঠান সারা দিনরাত, এমনকি কয়েক দিন/রাত চলার পর সত্যিকারের বাইসন শিকারে বের হয় তারা। ব্রাজিলের বোরোরো উপজাতির মানুষেরা এখনও জাগুয়ার

শিকারে যাবার আগে সারারাত্রি গান গেয়ে কাটায়। গান আর কিছুই নয়, কেবল জাগুয়ারের স্তবোক্তি ; জাগুয়ার কতো প্রয়োজনীয় ও উপকারী জন্তু এইসব। সকালে তারা একটি বড় জাগুয়ারের ছবি এঁকে, ছবির পাশে জড়ো হয়ে নাচ/গান করতে করতে ছবির দিকে বর্শা ছোঁড়ে। যখনই কোনো লোক, এই বর্শা দিয়ে ছবির জাগুয়ারের চোখটি ভেদ করতে পারে, তখনই তারা কৃতকার্যতার সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে শিকারে যাত্রা করে। এ ধরনের অনুষ্ঠান অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যেও দেখা যায়। তারা জাগুয়ারের পরিবর্তে ক্যাঙারুর ছবি ব্যবহার করে। এসব আনুষ্ঠানিক আচার-আচরণ পূর্বতন সংস্কারের অবশেষ ছাড়া আর কিছুই নয়। আদিবাসীদের এইসব অনুষ্ঠান ও আনুষ্ঠানিক ছবির সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রের তুলনা করে বৈজ্ঞানিকরা আদিমানবের মানসিকতা ধরতে পেরেছেন। এসব গুহাচিত্র ও সংস্কারের অবশেষ থেকেই আমরা জানতে পারি, তারা যেমন প্রয়োজনের তাগিদে জীবন-যাপনের তাগিদে পশুহত্যা করতো, তেমনি দৈবশক্তির প্রচণ্ডতায় বিস্মিত হয়ে এইসব প্রাণীদের পুজোও করতো। মনে করতো প্রাণীরা সদয় না হলে তারা কৃতকার্য হতে পারবে না। আসলে আদিম মানুষেরা, যেমন পিকিং মানুষরা, কৃতকার্যতা এবং অকৃতকার্যতার পেছনে যুক্তিসম্মত কোনো কারণ ভাবতে শেখেনি। চেষ্টাও করেনি। কারণ তাদের ব্রেন ও মানসিকতায় সে চেষ্টা ছিলো না। নিয়নডার্থাল এবং ক্রোম্যাগননের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। কঠিন জীবনযাপন প্রণালীকে সহজতর কী করে করা যায় তাদের প্রয়াস ছিলো সেই দিকেই। কঠিন জীবনযাত্রায় জীবনের দৈর্ঘ্যও ছিলো সীমিত। কাজেই রহস্যময় অতি শক্তিশালী প্রাকৃতিক শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে সাহায্য ভিক্ষা ছাড়া অন্য উপায় তাদের ছিলো না। সবচেয়ে রহস্যময় ছিলো প্রাণিকুল—ধূর্ত, শক্তিশালী। তারাই আবার খাদ্য। আদিম মানুষেরা সেই রহস্যময় পশুশক্তির কাছে ছবি এঁকে তাদের পুজো ক'রে, কৃপাভিক্ষা করতো বা তাদের ছবি বধ ক'রে কৃতকার্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতো, যেন কোনো রহস্যময় শক্তির সহায়তা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। তাদের কাছে ছবির

প্রাণিহত্যা আর যথার্থ প্রাণিহত্যায় অতএব প্রকৃত কোনো পার্থক্য ছিলো না। ক্রমশ এইসব অনুষ্ঠান ও সংস্কার জটিলতর হচ্ছিল, নাচ গান ইত্যাদির ব্যবহারে। কিন্তু মূল ভাবটি ছিলো একই—শিকারের কৃতকার্যতা। একেই আমরা শিকারের ম্যাজিক বলে থাকি। [ধীরে ধীরে নাচ, গান, অভিনয়, ছবি আঁকা পৃথক পৃথক শিল্পধারায় পরিণত হয়েছে, উৎস থেকে সরে এসে। এর বীজও ছিলো আদিম মানুষের অবচেতনে। যেমন ছবি আঁকতে গিয়ে সে ব্যবহার করতো রঙ। অভিনয় তখন অভিনয় ছিলো না। যথার্থ শিকারের অনুষ্ঠান। কাজেই তাকে সার্থক করতে কোনো ত্রুটি ছিলো না। মানুষের অবচেতনসঞ্জাত এই শিল্পবোধ সাহিত্য আলোচনার বিষয়।] বিভিন্ন জনসমষ্টির বিভিন্ন রকম বিশ্বাস ছিলো। সেসব বিশ্বাসের অবশেষ এখনও সংস্কারের আকারে বিভিন্ন জনসমষ্টির মধ্যে থেকে গেছে। মাডাগাস্কারের মানুষেরা বাড়িতে কোনো পুরুষ প্রাণীকে নিহত করতো না, কারণ তাদের বিশ্বাস ছিলো, তাতে তাদের শিকারী যোদ্ধার ক্ষতি হয়। মাডাগাস্কারের যোদ্ধারা শজারুর মাংস খেতো না; কারণ শজারুকে খুব ভীরু প্রাণী বলে ভাবা হতো। উপরন্তু, বলবান এবং সাহসী প্রাণীর মাংসভক্ষণ করলে মনে করা হতো, ভক্ষণকারীও খুব সাহসী ও বলবান হবে। জার্মানীতে, মনে করা হতো, পেঁচা পাগলামি ভালো করতে পারে। যদি পেঁচার হৃদয় এবং ডান পায়ের অংশ কেউ কবচ করে পরে থাকতো, সে পাগলা কুকুরের কামড়কেও ভয় পেতো না। এ ধরনের অনেক সংস্কারের কথা উল্লেখ করা যায়। কিন্তু শিকার থেকে জাত সংস্কারগুলিই প্রধান। এসকিমোরা এখনও এক ধরনের "ব্লাডার উৎসব" পালন করে থাকে। তারা যে কোনো ধরণের ব্লাডার ফুলিয়ে 'সিলের' গর্তে ঢুকিয়ে রাখে। বিশ্বাস এই, এতে সিলের সংখ্যা বাড়বে এবং মানুষে প্রচুর মাংস ও চর্বি পাবে।

শিকারের প্রসঙ্গে আরেক ধরনের সংস্কারও জন্ম নিচ্ছিল। ভালুকটিকে হত্যা করা হলো, মৃত ভালুক পড়েও থাকলো, শিকারীদের কিন্তু তাড়াহুড়ো নেই। আমেরিকান ইনডিয়ানরা ভালুক শিকারের আগে

কয়েকদিন উপোস করবে, আগে যেসব প্রাণীদের হত্যা করেছে তাদের কাছে অনেক কিছু উৎসর্গ করবে, তারপর ভালুক শিকারের পর মৃত দেহটিকে বাড়িতে নিয়ে এসে মৃতদেহের মুখে পাইপ জ্বালিয়ে দেবে। মৃত ভালুকটির পাইপ খাওয়া হয়ে গেলে তার কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইবে, কেন তাকে হত্যা করা হয়েছে সে ব্যাপারে দীর্ঘ কৈফিয়ত দেবে। অনুরোধ করবে, তাদের ওপর ভালুকটির যেন ক্রোধ না থাকে এবং ভবিষ্যতে যেন তাদের শিকার বাধাপ্রাপ্ত না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি দিতেও অনুরোধ করবে। ভালুকটিকে খাওয়া হয়ে গেলেও সংস্কার শেষ হয় না। ভালুকটির মাথাটি চিত্রিত করে একটি কাষ্ঠখণ্ড ঝুলিয়ে রাখে এবং বহুক্ষণ ধরে তার জয়গান গাইতে থাকে। আমেরিকান ইনডিয়ানদের এই উপজাতির নাম "ভালুক"। এইভাবেই কোনো উপজাতি 'নেকড়ে', কোনো উপজাতি 'দাঁড়কাক' বা 'শিয়াল' বা 'সাপ'। টোটেম প্রথার জন্ম এভাবেই হয়েছে কোনো এক সময়। 'টোটেম' শব্দটির অর্থ হচ্ছে—সম্প্রদায় (Clan)। অর্থাৎ উপজাতিটি ভালুক সম্প্রদায়ের বা কাক সম্প্রদায়ের বা নেকড়ে সম্প্রদায়ের ইত্যাদি। হয়তো যে সময় আদিম মানুষেরা গুহাগাত্রে প্রাণীদের ছবি আঁকতো সেই সময় থেকেই 'টোটেম' প্রথার উদ্ভব! কে বলবে? আদিম মানুষেরা এক এক গোষ্ঠীকে এই রকম কোনো প্রাণীর বংশোদ্ভুত বলে মনে করতো। অনেক সময় তাদের আদি পুরুষকে শিকার করা নিষেধ ছিলো। দাঁড়কাক শিকার না করা বা সাপ শিকার না করা এক জিনিস। কিন্তু ভালুক? বাঁচতে গেলে তাকে তো ভালুক মারতেই হবে। সুতরাং মৃত ভালুককে পুজো করার উপরোক্ত প্রথার উদ্ভব। পুরোনো দিনের এরকম সংস্কারের প্রতিধ্বনি আমাদের কালেও অনেক শোনা যায়। অস্ট্রেলিয়ার অনেক আদিবাসী নিজেদের গিরগিটি বা 'সাপ' বা পুরুষ টার্কি'র (Turkey cock) বংশধর বলে মনে করে। কঙ্গো অঞ্চলের অনেক আদিবাসী নিজেদের হাতির বংশধর বলে মনে করে। [আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও, নামের সাঙ্গে হাতি, বাঘ, পাখি ইত্যাদি উপাধিগুলি স্মর্তব্য!] কঙ্গো অঞ্চলের এই হাতির বংশধরেরা কিন্তু হাতি হত্যা করতে বাধ্য হতো।

তবু, হাতি হত্যার পর তারা এখনও হত্যাকারীকে শাস্তি দেওয়ার ভান করে একটি অনুষ্ঠান পালন করে। অস্ট্রেলিয়ার অনেক আদিবাসী বাদুড় থেকে এসেছে বলে মনে করে! মাডাগাস্কারের অনেক প্রজাতি আবার কুমীরের বংশধর!

(খ) **পশুপালন ও সংস্কার :** ঠিকমতো বলতে গেলে, পশুপালন নয়, প্রাণিপালন। কারণ, শুধু পশু নয়, প্রাণিজগতের অন্তত চল্লিশটিরও বেশি প্রজাতিকে পালন করে থাকে মানুষ। আদিকালে হয়তো এতগুলি প্রজাতিকে পালন করতো না ; ক্রমশ বেড়ে বেড়ে সংখ্যাটি এরকম দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকটি প্রজাতির বিবরণ দেওয়া সীমিত পরিসরে সম্ভব হবে না। আমাদের পুস্তকটির উদ্দেশ্যও তা নয়। তবে পরিচিত কিছু প্রজাতির কথা বলা হবে। মানুষের সঙ্গে প্রাণিজগতের সম্পর্কের কথাই যদি আমাদের মুখ্য আলোচ্য হয়, তাহলে প্রাণিপালন কথাটিও ব্যবহার করা যুক্তিসংগত নয়। কারণ, পালিত বিভিন্ন প্রজাতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে এবং একে অন্যের উপরে নির্ভরশীল। মানুষ তো অর্থনৈতিকভাবেই নির্ভরশীল। অনেকে সেই সব প্রাণীকেই পালিত প্রাণী বলে থাকেন, যারা মনুষ্য পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যারা সেই পরিবারের মানুষের আজ্ঞাপালন করে, যারা সেই পরিবারকে খাদ্য সরবরাহ করে এবং বিভিন্ন কাজকর্মে সাহায্যও করে এবং যারা ঐ পরিবারবন্ধ অবস্থাতেই সন্তানের জন্ম দেয়। কিন্তু হাতি বা বাজপাখি (Falcon) পরিবারবন্ধ অবস্থাতে সন্তানের জন্ম দেয় না, অথচ তারা পালিত প্রাণী। কাজেই প্রাণিপালন বলতে মানুষ ও প্রাণীর পরস্পর নির্ভরশীল অবস্থায় একত্রে বাস করাকেই বোঝায়। প্রতিপালিত প্রাণীদের চরিত্র, সম্ভবত এই প্রতিপালনের ফলেই, তাদের বন্য আদি পুরুষদের থেকে অনেকাংশেই বদলে গেছে, অনেকক্ষেত্রে তাদের আদি পুরুষেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বা অনেক ক্ষেত্রে তাদের আদি পুরুষদের কথা জানাই যায়নি। প্রতিপালিত প্রাণীদের মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে—(১) যারা খাদ্য ও পোশাক সরবরাহকারী

(বা উৎপাদনকারী বলাই সংগত), (২) সঙ্গী বা সহচর, (৩) বাহক প্রাণিকুল (Transport animals)। সঠিক জানা যায় না কীভাবে প্রতিপালন শুরু হয়েছিল। তবে শুরু হয়েছিল যে নিওলিথের আগেই এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের প্রাণীদের পালনই হয়তো প্রথমে শুরু হয়েছিল। তৃতীয় প্রকারের প্রাণিপালন শুরু হয়েছিল যখন মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ ভালোভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল এবং যখন পৃথিবীর নানা অঞ্চল সন্ধান করে ফিরছিল মানুষ, বসবাস, শিকার, কৃষিকাজ ও পশুপালনের উদ্দেশ্যে। মানুষের এধরনের অভিগমন চূড়ান্ত পর্যায়ে পেঁছেছিল ৪ থেকে ২ হাজার খ্রীস্টপূর্বাব্দের সময় এবং তৃতীয় প্রকারের বাহক প্রাণিকুল হাজার খ্রীস্টপূর্বাব্দের পূর্বেই নির্দিষ্ট হয়ে গেছিল।

সম্ভবত নিওলিথের আগে কোনো সময়ে কুকুরই প্রথম মানুষের সাহচর্যে এসেছিল। তারপর এসেছিল নিওলিথের সময় থেকে খাদ্য ও পোশাক সরবরাহকারী প্রাণিকুল—যেমন, গরু, ষাঁড়, ছাগল, ভেড়া, শূকর ইত্যাদি। পরবর্তীকালে বাহক পর্যায়ে এসেছিল উট, গাধা ও ঘোড়া।

কুকুর ও গবাদিপশু

কুকুরেরা যে মানুষের সহচর হয়েছিল অনেক আগেই, তার প্রমাণ নিওলিথ যুগের শুরুতেই পাওয়া যায়। ডেনমার্কে নিওলিথ রান্নাঘরের স্তূপের মধ্যে কুকুরের হাড় পাওয়া গেছে। বসতিটি ছিলো শিকারীদের বসতি, প্রস্তরযুগের। স্কারবুরোর কাছাকাছি। প্রফেসর উড্‌জোন্‌স্ মনে করেন কুকুরের সম্পূর্ণভাবে গৃহপালিত হতে কয়েকটি স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে। প্রথম—ক্যাম্প সহচরের পর্যায়, তারপর সহানুগমন এবং পরবর্তীকালে গৃহবাস। অনেকে মনে করতেন বিভিন্ন ধরনের নেকড়ে, শিয়াল ও বন্য কুকুরের গৃহপালিত অধস্তন পুরুষই আজকের নানা ধরনের কুকুর। কিন্তু এখন এটা মোটামুটি স্বীকৃত যে সাধারণ

নেকড়ে থেকেই কুকুরের উদ্ভব। আদিকালে মিশর ও ইথিওপিয়াতে কুকুর খুব সম্মান পেতো। মনে করা হতো মৃত্যুর পরে মানুষের আত্মাকে কুকুরের মতোই হতে হবে। হয়তো এজন্যই, অর্থাৎ মিশরীয় ধর্মীয় ব্যাপারে জড়িত হওয়ার জন্যই ইসরায়েলাইটরা কুকুরকে পছন্দ করতো না। বেশ কয়েক হাজার বছর ধরে কুকুর তাদের আদিপুরুষ নেকড়ের মতোই ছিলো হয়তো, কিন্তু খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের সময়ে ব্যাবিলনীয়রা ম্যাসটিফ জাতীয় কুকুরকে পালন করতো। তাদের শিল্পকর্ম থেকে অন্তত তাই বোঝা যায়। মিশরীয়রা কুকুরকে দেবতার সমান মনে করতো। আসলে বহু প্রাণীকেই মিশরীয়রা দেবতাজ্ঞানে পুজো করতো। এইসব প্রাণী দেবতাদের মধ্যে বিখ্যাত হলো—নেকড়ে, বাজপাখি (Falcon) ও কুকুর আনুবিস (Anubis) [এই জন্যই কুকুরমুখো বেবুনের ল্যাটিন নাম হয়েছে—প্যাপিও আনুবিস।], ভেড়া, আইবিস্, ষাঁড়, সিংহ এবং গুবরে পোকাও (Scarab bettle)। গুব্‌রে পোকাকে সূর্যদেবতা মনে করা হতো। কিছু কিছু দেবতা ছিলো—শরীর এক প্রাণীর কিন্তু মাথাটি অন্যপ্রাণীর। যেমন, হাথার—শরীর গরুর মতো কিন্তু মাথাটি মানুষের। আসলে, এই রকম প্রাণিপুজোর জন্ম গৃহপালন থেকেই। যে সমস্ত প্রাণী মানুষের উপকারে লাগতো, মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তি করতো বা ফসল উৎপাদনে সাহায্য করতো, তাদেরকেই মানুষ দেবতাতুল্য ভেবে পুজো করতো। এভাবেই ধর্মীয় সংস্কারের জন্ম। আবার যেসব প্রাণীদের আচরণ, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি মানুষ বুঝে উঠতে পারতো না, সেসব প্রাণীদেরও মানুষ কোনো অজ্ঞাতশক্তির ধারক বলে পুজো করতো এবং সংস্কারের জন্ম হতো। মিশরীয়রা গরু এবং ষাঁড়কেও পুজো করতো। পারসীয়রাও তাই করতো। হিন্দুরাও। গরুকে দেবতার মতো দেখা হতো প্রায় সর্বত্রই। ক্রীট দ্বীপের অধিবাসীরা, আফ্রিকার উপজাতিরা এবং প্রাচীন গ্রীসদেশের অধিবাসীরাও গরুকে দেবতাজ্ঞান করতো। এর কারণই হলো, গরু সেই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষকে খাদ্যাদি প্রদান করতো—যেমন, মাংস ও দুধ এবং পরবর্তীকালে গৃহ-পালিত অবস্থায় বর্ধিত হতো। মানুষের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে

আরম্ভ করেছিল গরু, ষাঁড় ইত্যাদি সেই আদিকাল থেকেই। নিওলিথ মানুষদের সময় থেকেই প্রচুর গরুর ব্যবহার দেখা যাচ্ছে।

গরুর পূর্বপুরুষ আওরকদের (Auroch) আজকাল আর পাওয়া যায় না। লুপ্ত হয়ে গেছে। যেহেতু পরিপূর্ণভাবে প্রাণিপালন নিওলিথের সময় থেকেই পাওয়া যাচ্ছে, সেহেতু কৃষিকাজের উদ্ভাবনার সঙ্গে প্রাণিপালনের সম্পর্ক একটা আছেই। কিন্তু মানুষ অন্য প্রয়োজনেও প্রাণিপালন করতো। গরু, ষাঁড়, কৃষিকাজ ছাড়াও মাংস বা দুধের জন্য প্রয়োজন হতো। কাজেই নিওলিথের আগেই তারা গৃহপালিত হতে শুরু করেছিল এমন অনুমান করা হয়তো অসঙ্গত নয়। গবাদিপশু সম্পর্কে ধর্মীয় সংস্কার প্রাচীনকালে মিশরের একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পেঁছেছিল। মিশরীয় পুরোহিতরা মনে করতেন যে ষাঁড় (Bull) হচ্ছে তাঁদের দেবতা ওসিরিসের প্রতিরূপ আর ওসিরিসের বোন আইসিস গরু-দেবতার মধ্যে বাস করেন। মিশরের পবিত্র প্রাণীদের মধ্যে কাজেই ষাঁড় এবং গরুই ছিলো অন্যতম। মিশরের এক এক নগরে ষাঁড়কে এক এক নামে পুজো করা হতো। কোথাও এর নাম ছিলো মুনেভিস্ আবার কোথাও বা বিখ্যাত এপিস্ বা আপিস্। পবিত্র ষাঁড় কিছু কিছু লক্ষণ দেখে চেনা যেতো। প্রায় তিরিশ রকমের লক্ষণ ছিলো। তার মধ্যে কয়েকটি হলো—(১) শরীরের ডানদিকে চন্দ্রাকৃতি চিহ্ন বর্তমান থাকবে, (২) জিভের নীচে এক ধরনের জট্ (Knot) থাকতে হবে, (৩) রঙ হতে হবে কালো এবং ত্বক খসখসে, (৪) কপালে থাকতে হবে সাদা চৌকো চিহ্ন, (৫) পিছনে থাকতে হবে ঈগল চিহ্ন এবং (৬) লেজের শীর্ষদেশ দ্বিধাবিভক্ত থাকতে হবে। এরকম ষাঁড় পাওয়া গেলে তাকে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে পুজো করা হতো ২৫ বছর ধরে। সোনা, রুপো ও মূল্যবান পাথর দিয়ে তাকে সাজানো হতো। প্রত্যেকদিন পবিত্র পার্কে তাকে ভ্রমণ করাতে নিয়ে যাওয়া। ভালো ভালো খাবার খেতে দেওয়া হতো। সুগন্ধিযুক্ত জলে স্নান করানো হতো। পঁচিশ বছর—কারণ ওসিরিসের আত্মা পঁচিশ বছর পর বুড়ো বলদের মধ্যে থাকবে না।

নীল নদীর বাৎসরিক বন্যার সময় প্রতি বছর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করতো মিশরীয়রা আকাশে। যেন এই নক্ষত্রটিই বন্যার সংকেত। কুকুর যেমন ঘেউ ঘেউ করে আগন্তুকের অস্তিত্ব মালিককে জানায়, মিশরীয়রা এই নক্ষত্রটিকেও সেই রকম মনে করতো। সুতরাং কুকুরের নামেই এই নক্ষত্রটির নামকরণ হয়েছিল—সিরিয়াস (Sirius)। ওসিরিস ও আইসিসের মন্দির গাত্রে সুতরাং কুকুরের ছবি চিত্রিত হতো।

গবাদিপশু প্রতিপালন সম্বন্ধে বলতে গেলে, হিন্দুদের কথা অবশ্যই বলতে হয়। ভারতীয় আর্যেরা ধীরে ধীরে মূলত কৃষিকাজ অবলম্বন করে বসতি স্থাপন করছিলেন ও জীবনধারণে অভ্যস্ত হয়ে উঠছিলেন। অনেকে, ভারতে আগমনের পূর্বে আর্যদের যাযাবর পশুপালকজাতি বললেও হয়তো ভারতে আসবার আগেও তাঁরাও কৃষিজীবী ছিলেন। তাছাড়া এখন মোটামুটি এ সত্যটা প্রতিষ্ঠিত যে আর্যদের আগমন একবার নয়, কয়েকবারই হয়েছিল। সে যাই হোক, ভারতীয় কৃষিজীবী হিন্দু আর্য-সম্প্রদায় সেই আদিকাল থেকেই গবাদিপশুকে অত্যন্ত সম্মান দিতেন, নন্দিত করতেন। এখনও করা হয়। আগে তো গোবধ ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাপ বলে মনে করা হতো। যদি দুর্ঘটনাবশতঃ কোনো গৃহপালিত গরু বা বলদ মৃত্যুমুখে পতিত হতো, তাহলে মালিককে মুখে খড় নিয়ে দরজায় দরজায় ভিক্ষে করে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। আগে রাজারা মুনি ঋষিদের গোদান করে পুণ্য অর্জন করতেন। গবাদিপশুর সংখ্যা যেসব দেশে বেশি ভারতবর্ষ তার মধ্যে অন্যতম। প্রায় ২০০ মিলিয়ন। ভাবতে অবাক লাগে তবু এখানে দুধ ও পুষ্টির অভাব।

আফ্রিকাতেও এখনও অনেক উপজাতির প্রধান অর্থনৈতিক অবলম্বন গৃহপালিত গরু। শুধু অর্থনৈতিক অবলম্বন নয়, সামাজিক গঠনও নির্ভর করে গরুর ওপর। যেমন মাসাই। মাসাইরা ডাকাতি করেও গবাদি পশু সংগ্রহ করে। যেসব যুবকদের ওপর এ ধরনের কাজের ভার থাকে তাদের যোদ্ধার মতো সম্মান মর্যাদা দেওয়া হয়। গরুর নার্ভ থেকে কৃত্রিম সিরিঞ্জ দিয়ে রক্ত বের করে পানও করে মাসাইরা।

ভেড়া ও ছাগল

এরপর আসে ভেড়া ও ছাগলের কথা। কোনো কোনো দেশে ভেড়া গবাদিপশুর থেকেও বেশি প্রয়োজনীয়। ভেড়ার প্রধান প্রয়োজন মাংস, উল ও সারের জন্য। পৃথিবীতে ভেড়া গরু ও ছাগলের থেকে হয়তো পরে এসেছে, কিন্তু ভেড়ার ব্যবহার শুরু হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই। আশ্চর্যের বিষয়, আমরা এখনও জানি না, ভেড়ার বন্য আদি-পুরুষ কি ছিলো? অনেকে মনে করেন, দক্ষিণ ইউরোপের মাউফ্লন (Moufflon) জাতীয় ভেড়া, যা এখনও কর্সিকা বা সার্ডিনিয়াতে দেখা যায়, কিংবা পশ্চিম এশিয়ার বুনো ভেড়াই হয়তো আজকালকার ভেড়াদের আদিপুরুষ। কিন্তু এই দুই জাতীয় ভেড়ারই কোনো উল নেই। উল উদ্ভবের সমস্যা সম্পর্কে অস্ট্রেলিয়াতে ভেড়া নিয়ে অনেক গবেষণা করা হচ্ছে, কিন্তু এ সমস্যার কোনো সুষ্ঠু উত্তর পাওয়া যায়নি। দু'রকমের সম্ভাবনার কথা মনে করা যেতে পারে—(১) গৃহপালিত ভেড়াদের আদি-পুরুষ অনেক আগেই বিলুপ্ত বা (২) উলের উদ্ভব প্রকৃতির খেয়ালমাত্র। ক্রমশ উল ভেড়ার শরীরে স্থায়ীরূপ ধারণ করেছে। কিছু কিছু আদিম ভেড়ার লম্বা চর্বিওয়ালা লেজ আছে। অধিকাংশের চর্বি অবশ্য জমা থাকে পশ্চাদভাগের রাং-এ। বুনো আদিপুরুষদের রঙ হয়তো নানা রকমের হতো, কিন্তু সাদা আবরণ শীঘ্রই দেখা যেতে থাকলো। সাদা ঝাঁকের মাঝে অনেক সময় কালো ভেড়াও দেখা যায় আবার কালো মুখের সাদা ভেড়াও দেখা যায়। যেমন, সাফোক (Suffolk) বা স্কটিশ কালো মুখের ভেড়া। বন্য ভেড়াদের (পশ্চিম এশিয়ার) শিং আছে। শিংগুলি পাকানো। ছাগলের ক্ষেত্রে পাকানো নয়। গবাদি পশুর মতো এরাও প্রধানত ঘাস খায়। এখন নানারকম বৃক্ষমূল ও ফসলাদি খেতেও শিখেছে। ছাগলে অবশ্য গাছের পাতা খেতেই বেশি ভালোবাসে, যদিও আমাদের প্রবাদবাক্য অন্য কথা বলে। (ছাগল কখনও করতাল চিবিয়ে খেয়েছে বলে শোনা যায়নি অবশ্য)।

গৃহপালিত ছাগলের আদিপুরুষ পশ্চিম এশিয়ার বন্য ছাগল।

এখন পৃথিবীতে প্রায় সর্বব্যাপ্ত, বন্য প্রাণী হিসাবেই, তবু সম্ভবত স্পেন দেশেই এই প্রাণীটি প্রাথমিক ভাবে পাওয়া যেতো বলেই মনে করা হয়। তারপর ফ্রান্স, তারপর গ্রেট বৃটেন ও পৃথিবীর অন্যত্র। প্রাচীন গ্রীস বা রোমে খরগোস ছিলো না। কিন্তু ২০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের সময় রোমানেরা স্পেনের দখল নিলে, রোমেও গৃহপালিত প্রাণী হিসাবে খরগোসের প্রচলন হয়েছিল। পোশাকে কোমল পশুলোমের ব্যবহারের জন্যও খরগোসের কদর আছে।

কোমল লোমযুক্ত প্রাণী

অবশ্য শুধুমাত্র কোমল পশুলোমের ব্যবহারের জন্যও বহু প্রাণীকে পালন করা হয়। যেমন, দক্ষিণ আমেরিকার "কয়পু" (Coypu) নামক এক প্রকার মূষিক জাতীয় প্রাণী, যার চামড়াও ওয়াটারপ্রুফের কাজ করে। এদের গর্ভধারণ কাল বহুদিন—প্রায় ১৪০ দিন। মূষিক জাতীয় প্রাণীর পক্ষে প্রায় অকল্পনীয়। খরগোসের মাত্র ৩০ দিন। খরগোসও মূষিকজাতীয় প্রাণী। 'কয়পু'র আকারও খরগোসের মতো। লোমের জন্য উত্তর আমেরিকায় মাস্ক-র‍্যাট পোষারও চলন আছে। কানাডার 'বীভার'ও লোমের জন্য বিখ্যাত। এদের পালন করার চেষ্টা করা হয় বটে, কিন্তু একে বোধ হয় 'পালন' বলে না। ফাঁদ পেতে ধরে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এদের। কারণ বীভারেরা প্রকৃতই বন্য। রোমশ প্রাণীদের মধ্যে রুপোলী শৃগাল (Silver fox) ও মিন্ক্ (Mink) অন্যতম। মিন্ক্ বেজী জাতীয় একপ্রকার প্রাণী। রুপোলী শৃগাল ও মিন্কের বন্যরূপ উত্তর আমেরিকাতে দেখা যায়। নির্বাচিত প্রজনন পদ্ধতিতে এদের লোমের রঙের নানারকম প্রকার ভেদ ঘটানো যায়। এইসব রঙীন লোমের চামড়ার দামও অনেক। রুপোলী শৃগালের রঙীন চামড়ার ব্যবসার জন্য উত্তর আমেরিকায় অনেক কারখানাও আছে। আর্কটিক অঞ্চলের নীল শৃগালের লোম ও রোমশ চামড়াও খুব দামী। আলাস্কার উপকূল প্রদেশে এর উৎপাদনের ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু বস্তুত এসব প্রাণীদের

'ক্যারিবু'র সঙ্গে পালিত বল্গাহরিণের কোনো পার্থক্য নেই বিশেষ। বল্গাহরিণের বেশ কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। হরিণদের মধ্যে একমাত্র বল্গাহরিণকেই গৃহপালিত করে তোলা গেছে। এটাই হচ্ছে একমাত্র হরিণ যাদের পুরুষ ও স্ত্রীজাতি উভয়েরই শিঙ (Antler) আছে। অন্য হরিণের চেয়ে এরা আরো বেশি উত্তরে যেতে সক্ষম। আর্কটিক বৃত্তের মধ্যে বা ঠিক বাইরেই এদের অবস্থিতি। হিমালয়ের চমরীগাই বা অ্যান্ডিসের 'লামা'দের মতো এরা একটা বিশেষ অঞ্চলেই পালিত। আমেরিকায় বন্য বল্গাহরিণকে 'ক্যারিবু' বলা হয়। যদিও কোনো প্রমাণ নেই, তবু মনে করা হয়, এদের বহু শতাব্দী আগেই পোষ মানানো হয়েছিল। পঞ্চম খ্রীস্টপূর্বাব্দের চীনদেশীয় লিপি থেকে জানা যায় যে উত্তরে বর্বরেরা এক ধরনের হরিণ ব্যবহার করত। উত্তরের বর্বরদের ব্যবহৃত হরিণ বল্গাহরিণ কিনা জানা যায় না অবশ্য। হলেও হতে পারে। তবে তারা এখনকার বল্গাহরিণের মতো শ্লেজ টানতো কিনা জানা যায় না। অথবা, সাইবেরিয়া অঞ্চলে, এখন যেমন ঘোড়ায় চড়ার মতো বল্গাহরিণ চাপে মানুষে, ঠিক তেমনিভাবে ঐ হরিণগুলি ব্যবহৃত হতো কিনা তাও জানা নেই। এরা বিশাল বিশাল দলে খোলা জায়গায় থাকে, মালিকের পাহারায়। সময় সময় এরকম এক একটা দলে ১৫ লক্ষ পর্যন্ত বল্গাহরিণ থাকতে পারে। দুধ এবং মাংসের জন্যও বল্গাহরিণ খুব মূল্যবান। আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য স্কটল্যাণ্ডে প্রায় ৭০০ বছর আগেই বল্গাহরিণ হারিয়ে গেছে। এখন আবার আমদানীর চেষ্টা চলছে। কিন্তু বল্গাহরিণ পালনের আবহাওয়া হয়তো সেখানে আর নাই।

খরগোস/শশক

খরগোস ও শশক জাতীয় প্রাণীকে হয়তো পোষ মানানো হয়েছিল প্রধানত মাংসের জন্যই। পরবর্তীকালে বিবর্তিত ফ্যান্সি-ভ্যারাইটি শুধুমাত্র গৃহপালনের জন্যই ব্যবহৃত হয়। বুনো খরগোস পশ্চিমবঙ্গেও বহু জায়গাতে এখনও খাদ্য হিসাবেই প্রধানত ব্যবহৃত হয়। খরগোস যদিও

বহু অংশে, বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে (আমাদের দেশেও, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে) শূকরদের খোঁয়াড়ের মধ্যে ধরে রাখা হয় না। গ্রামে ছাড়া অবস্থাতেই ঘুরে বেড়ায়। এভাবে ছাড়া অবস্থায় শূকরেরা লোকালয় ছেড়ে মাঝে মাঝে চলে যায় এবং কোনো কোনো শূকর আবার প্রকৃতই বন্য হয়ে যায়।

জলমহিষ ও চমরীগাই

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তথা ভারতের আরো দুটি গৃহপালিত পশুর পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। এ দুটি হলো—মহিষ [যা প্রকৃত-পক্ষে জলমহিষ (Water buffalo)] ও চমরীগাই। জলমহিষ ক্রান্তীয় অঞ্চলের গৃহপালিত প্রাণীদের ভেতর অনেক সময় সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়। কেবল ভারতেই সম্ভবত ২০ কোটিরও বেশি মহিষ থাকতে পারে। হাজার পাঁচেক বছরেরও আগে আঁকা মহিষের ছবিও পাওয়া গেছে। এশিয়ার প্রায় সর্বত্র, এমনকি ডানিয়ুব বেসিনেও মহিষ চাষাবাদের কাজে ব্যবহৃত হয়। দুধের জন্যও মহিষ প্রতিপালিত হয়। জল/কাদায় থাকতে এরা খুব পছন্দ করে। আমরা সাধারণত মহিষকে বোকা বলে মনে করলেও এরা আসলে খুব বুদ্ধিমান প্রাণী। মালয়ে একটি মহিষকে শিঙে করে বালতি বয়ে নদীতে গিয়ে বালতি ভর্তি জল নিয়ে আসতে শেখানো হয়েছিল।

উত্তরে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে তিব্বতীরা বহু শতাব্দী আগে হয়তো বুনো চমরীগাইকে (Yak) পোষ মানিয়ে ছিল। দুধের জন্য, মাংসের জন্য, আবার গিরিবর্ত্মের মধ্যে দিয়ে জিনিসপত্র বহন করার জন্যও। শেষোক্ত কাজটির জন্য এরা প্রায় অপরিহার্য।

বল্গাহরিণ

যেসব প্রাণীদের উৎস সম্বন্ধে ভালোভাবে কিছু জানা যায় না, বল্গাহরিণ (Reindeer) তাদের মধ্যে অন্যতম। বন্য বল্গাহরিণ বা

কিছু কিছু গ্রীকদ্বীপপুঞ্জেও এরকমের বন্য ছাগল এখনও দেখা যায়। কেবল দুধ খাওয়া ছাড়া, পশ্চিম ইউরোপে ছাগলের অন্য কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, মধ্যপ্রাচ্যে, আফ্রিকার অংশবিশেষে, ভারতে, স্থানীয় অর্থনীতিতে ছাগলের অবদান প্রচুর। ছাগ প্রজাতির চামড়া, দুধ, মাংস সবকিছুই ব্যবহৃত হয় এদেশে। মাংসের জন্য ছাগ-হত্যা আমাদের দেশেই হয়তো সর্বাধিক। বিশেষ বিশেষ আবহাওয়াতে বিশেষ ধরনের ছাগল থেকে উলও পাওয়া যায়। যেমন, কাশ্মীরী উল। এরা যূথচারী, বুদ্ধিমান এবং সাহসী। উত্তর ভারতের পটভূমিকায় জিম করবেট এমন একটি ছবি তুলেছিলেন যাতে একটি পুং-ছাগ (পাঁঠা) চিতার সঙ্গে শুধু যুদ্ধই করেনি, চিতাটিকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল। এরা শুধু সর্বভুক বলেই পরিচিত নয়, সর্বত্রগামীও (এই কারণেই হয়তো গ্রীক দেবতা প্যানের পায়ে ছাগলের খুর)।

মাংসের প্রয়োজনে শূকরের পালনই বোধহয় অত্যধিক। উদ্ভিদ খাদ্যকে কমখরচে প্রাণী-প্রোটিনে পরিণত করতে গেলে সম্ভবত শূকর পালনই দ্রুততম পন্থা। শূকরের মাংস প্রতিদিন এক পাউন্ড করেও বেড়ে যেতে পারে। নির্দিষ্ট ওজনে, নির্দিষ্ট বয়সে শূকর হত্যা করা হয়—পোর্ক, বেকন, হ্যাম ইত্যাদি বাজারজাত করার জন্য। পেনাণ্ট নামে একজন বৃটিশ প্রাণীবিদ প্রায় দু'শতাব্দী আগে বলেছিলেন, "শূকরকে কৃপণের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জীবিতাবস্থায় এর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই, কিন্তু মৃত্যুর পর জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য।" ইউরোপীয় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বন্য শূকরেরাই এদের আদিপুরুষ। চীনাশূকরও সম্ভবত। সব ধরনের শূকরেরাই প্রায় সর্বভুক ঝাড়ুদার (Scavenger)। নরম মাটির উপরতলে এরা লম্বা নাক ও মুখ দিয়ে (Snout) গর্তও করতে পারে। ইসরাইলে এবং ভূমধ্যসাগরের অন্যান্য অঞ্চলে পোর্ক ভক্ষণ নিষিদ্ধ। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষও শূকরের মাংস ভক্ষণ করে না। গবাদিপশু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদির পরে হলেও, প্রায় তৃতীয় খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকেই শূকরের গৃহপালন শুরু হয়। পৃথিবীর

গৃহপালিত ঠিক বলা যায় না। ব্যবসার উদ্দেশ্যেই এদের পালন নয়, রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, প্রায় বন্য অবস্থাতেই। এই জাতীয় প্রাণিকুলের মধ্যে নতুন আমদানী 'চিঞ্চিলা' (Chinchilla)। আণ্ডিস্ পর্বতমালার ঢালে মূষিকজাতীয় চিঞ্চিলা প্রচুর পাওয়া যায়। এদের লোম সবচেয়ে নরম, সবচেয়ে সূক্ষ্ম এবং সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই কম্বল তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। সবচেয়ে মূল্যবান ফারকোটে ব্যবহৃত হয় এদের চামড়া। এভাবে ব্যবহৃত হতে হতে নিজেদের দেশেই এরা লুপ্ত হতে চলেছে। নিরামিষ উদ্ভিদের তৈরী বড়ি খাইয়ে বৈজ্ঞানিকেরা এদের পালন করতেও পারছেন।

অস্ট্রিচ

রোমশ পালিত প্রাণীর কথা বলতে গেলে অস্ট্রিচ পাখির কথা চলে আসবেই। অস্ট্রিচ পাখির ডিমের ব্যবহারও অবশ্য আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের কাছে খুব প্রয়োজনীয়। আফ্রিকার বুশম্যানেরা (মাত্র অল্প কিছু বুশম্যান এখনও অবশিষ্ট আছে!) এখনও অস্ট্রিচ পাখি শিকার করে, চামড়া থেকে পোশাক বানায়, ডিম ভেঙে পানপাত্র করে, আবার ডিমের টুকরোর মালা গেঁথে প্রেমিকাকে উপহার দেয় কণ্ঠহার। অস্ট্রিচ পাখির পালকও কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হতো। এখন কমে গেছে। এতো প্রচুর পরিমাণে চলতো পালকের ব্যবসা যে পোর্ট এলিজাবেথে সপ্তাহে দুদিন নীলামের সময় এক-একটা পালকের বোঝা কখনও কখনও ২৫০০০ পাউণ্ডে নীলাম হতো। এমনই ছিলো এর চাহিদা। লণ্ডনের পাইকারী ব্যবসায়ীরা মাসে ১০/১৫ টন পালকের ব্যবসা করতো সে সময়। পোশাকে অস্ট্রিচ পাখির পালক ব্যবহারের ফ্যাশন সম্ভবত ফারাওদের সময় থেকেই চলে আসছে। প্রায় ১৮৭০ খৃীস্টাব্দ পর্যন্ত, শিকার করেই পালক সংগ্রহ করা হতো, কিন্তু ফরাসীরা আলজিরিয়াতে কিছু অস্ট্রিচ পাখি বন্দী অবস্থাতে পালন করতে সক্ষম হয়েছিল।

কিছুদিনের মধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকায় বিভিন্ন অস্ট্রিচ-ফার্মের জন্ম হয়ে গেল। তারপর ক্যালিফোর্নিয়াতে, তারপর অস্ট্রেলিয়ায়, তারপর দক্ষিণ ইউরোপে। ১৯২০ সাল থেকে ফ্যাশনের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ততদিনে অস্ট্রিচ পাখির বংশ প্রায় নির্মূল হয়ে গেছে। মিশরীয় সভ্যতার সময় হয়তো কিছু কিছু পাখিকে বন্দী অবস্থায় রাখা হতো। থিব্স্-এ একটা ছবিতে কিছু শিকারীর ছবি আছে, যারা জীবিত অস্ট্রিচ, পালক, ডিম ইত্যাদি নিয়ে শিকার করে ফিরছে।

মোরগ/মুরগী

গৃহপালিত পাখির কথাই যখন উঠলো, তখন সাধারণত যেসব গৃহপালিত পাখি আমরা জানি (যারা খাবার হিসাবে ব্যবহৃত হয় বা খাবারের উৎপাদক শ্রেণীভুক্ত) সেরকম কিছু পাখির কথা আলোচনা করা যেতে পারে সংক্ষেপে। যেমন—পোলট্রির পাখি মোরগ।মুরগী। ডিম ও মাংসের সরবরাহের জন্যই এদের প্রধানত পালন করা হয়। নিওলিথ পর্যায়ে মুরগীর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়নি। মানুষের নাট্যমঞ্চে এদের প্রবেশ অনেক পরে। নিওলিথ মানুষের বাসভূমির ধারকাছের ফসিলেও এদের পাত্তা নেই। এদের উল্লেখ নেই বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টেও। মিশরীয় সভ্যতার শেষ পর্যায় থেকে এদের সন্ধান পাচ্ছি, সম্ভবত গ্রীকদের আনুকূল্যে। কিন্তু এসিরিয়া মিশরকে, থুথমোসের সময়ে (১৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) মুরগী উপহার দিয়েছিল বলে জানা যায়। নবম খ্রীস্টপূর্বাব্দে হোমার এদের সম্পর্কে কিছু জানতেন না, যদিও তিনি গৃহপালিত হাঁসের কথা লিখেছেন। ৫ম শতাব্দীতে অবশ্য গ্রীকদের মধ্যে মুরগীপালন প্রথার বেশ চলন ছিল। রোমানরাও মুরগী পালনকে খুব আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল এবং তারাই এই যুগপর্বের প্রারম্ভে কৃত্রিম প্রজনন প্রথার উদ্ভাবকও। অবশ্য সে সময় উৎপন্ন ডিম বেশি ছিল না। গড়ে মুরগী পিছু বছরে ৩০টি বা ৪০টি বা অধিকপক্ষে ৬০টির বেশি ডিম আগে পাওয়া যেত না। বর্তমানে

ভালো মুরগী বছরে ২০০টি ডিমও পাড়ে। ডিমগুলিকে আকারেও অনেক বড় করা সম্ভব হয়েছে। গ্রীকদের বা রোমানদের সময়ে মুরগীর ব্যবহার ছিল আরো অদ্ভুত ধরনের। মুরগী লড়াই কিংবা সময় ঠিক করা অর্থাৎ ঘাড়ির কাজ। মুরগী লড়াই পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে এখনও বেশ প্রচলিত। আমরা গ্রীকদের কাছে শিখেছি না কি গ্রীকরাই আমাদের কাছে শিখেছে সেটা সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করেন যেসব নৃতত্ত্ববিদ তাঁদের অনুসন্ধানের বিষয়। মুরগীর ঘড়ি-ব্যবহারও নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথম মুরগী ডাকার সঙ্গে দিন আরম্ভ হতো এবং তৃতীয়বার শব্দের সময় যখন 'তিনি' সেণ্টপিটারের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন নিশ্চয়ই সকালবেলার নির্দিষ্ট কোনো মুহূর্ত ছিলো। বহু শতাব্দী পরে মধ্যএশিয়ায় ক্যারাভানের সঙ্গে অ্যালার্মঘড়ির কাজ করার জন্য মুরগী রাখা হতো। এখনো 'রুস্টার' মোরগ বহু জায়গায় পোলট্রি পাহারার কাজ করে। আফ্রিকায় আশান্তিদের মধ্যে প্রবাদই আছে, "মুরগী মদ খেলে বাজপাখির কথা ভুলে যায়।" অবশ্য আধুনিক মুরগীর বন্য পূর্বপুরুষ ভারতের বা ব্রহ্মদেশের লাল বড় বুনো মুরগী। এখন মুরগীর ডিম ও মাংসের চাহিদা দিন দিন এত বেড়ে যাচ্ছে যে পোলট্রিতে মুরগীর চাষও বাজার ধরে রাখতে পারছে না। ১৯৫১ সালে প্যারিসে সমস্যাটি সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা মিলিত হয়েছিলেন বিশ্ব পোলট্রি বিজ্ঞান এসোসিয়েশনের একটি বিশেষ সভায়। পোলট্রিতে আফ্রিকার অবদান হলো গিনি-মুরগী (Guinea-fowl)। মুরগীর স্বাভাবিক আচরণ থেকেও (Behaviour) মানুষের মনে অনেক সংস্কারের জন্ম নিয়েছিল। মুরগীর আচরণ অনেক সময় ভবিষ্যতের শুভ বা অশুভ সূচনার প্রতীক হিসাবে দেখা দিতো। রোমানরা যুদ্ধযাত্রার সময় মুরগী সঙ্গে নিয়ে যেতো। মুরগীর যদি ক্ষুধামান্দ্য দেখা যেতো তাহলে মনে করা হতো যুদ্ধে পরাজয় হবে; আবার মুরগী যদি দিবাবসানে খুঁটে খেতো বা মুরগীর ক্ষিদে বজায় থাকতো তাহলে যুদ্ধে জয়লাভ ছিল অবশ্যম্ভাবী। মুরগীর সম্মান খুব বেড়ে যায় দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের একটি ঘটনার পরে। ঘটনাটি উল্লেখ

করা যেতে পারে। জয়-পরাজয় নির্ধারণকারী যুদ্ধের দিনে ভবিষ্যদ্বক্তারা অধিনায়ক কনসাল ক্লডিয়াসকে জানালো যে, জাহাজে যে পবিত্র মুরগীরা রয়েছে তারা খাবার খাচ্ছে না। কেউ এটা ভেবেও দেখেনি যে মুরগীরা সামুদ্রিক রোগে সাময়িকভাবে আক্রান্ত হয়েছিল। সবাই একথাই ভাবলো যে এটা খুব অশুভ লক্ষণ। ক্লডিয়াস অবশ্য কোনো কথা শুনলেন না, যুদ্ধও বন্ধ রাখলেন না। বরং মুরগীগুলোকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবার আদেশ দিলেন। লোকজন এত বেশি সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে গেছিল এবং মুরগীগুলোর অবস্থা দেখে ও অশুভ সংকেত দেখে এতই ভীত হয়ে গেছিল যে, সৈন্যরা যুদ্ধই করলো না। শত্রুদের কোনো বাধাই দিলো না। মুরগীদের ব্যবহার যখন বলেই দিচ্ছে যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী তখন যুদ্ধ করেই বা কী হবে! ভারতেও মুরগীর ডাক নিয়ে নানা সংস্কার আছে। ভারত থেকে গেছিলো চীনে, প্রায় হাজার তিনেক বছর আগে। মুরগী চীনে এমনই শুভ প্রতীক ছিলো যে সম্রাট ফু-শি আদেশ জারি করে প্রজাদের মুরগী পালনে বাধ্য করেছিলেন। পারস্যেও তাই। রাজা প্রথম দারাউস (Darius—I) প্রায় ২৫০০ বছর আগে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের পরে দেশে মুরগী নিয়ে গেছিলেন। মুরগীর অশুভ শক্তি বিতাড়নের ক্ষমতাকে পারস্যের লোকেরা এতই বিশ্বাস করতো যে তারা সম্রাটের আদেশ নতমস্তকে মেনে নিয়ে মুরগী পালন শুরু করেছিলেন। সেখান থেকে কৃষ্ণসাগর উপকূলে এবং সেখান থেকে আবার ইউরোপে মুরগী-সংস্কারের যাত্রা। এখনো ইউরোপের পুরোনো বাড়িতে এমনকি কিছু কিছু নতুন বাড়িতেও অশুভ শক্তি বিতাড়নের প্রতীক 'ওয়েদার কক্' দেখা যায়।

হাঁস

হাঁস কখন গৃহপালিত করা হলো বলা খুব কঠিন। সভ্যতার প্রথম পর্বেই হাঁসের উল্লেখ দেখা যায় পুরোনো চীনা ও ভারতীয় লিপিতে, সাহিত্যে। কিন্তু তখনও এগুলো গৃহপালিত ছিলো কিনা নির্দিষ্ট

করে বলা কঠিন। মিশরে অবশ্য হাঁস পোষা হতে এবং হাঁসকে খুব পবিত্র মনে করা হতো। হাঁস খাওয়ার কথা উল্লেখ করেন প্রথম হোমার। তা প্রায় ৯০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের কথা। বাইবেলে আশ্চর্যজনকভাবে হাঁস অনুপস্থিত। হোমার ওডিসিতে ঈগল পাখির হাঁস চুরির কথা উল্লেখ করেছেন। মিশরের মতো ভারতেও হাঁসকে খুব পবিত্র মনে করা হতো। যেমন—হাঁসকে আমরা সরস্বতীর বাহন রূপে কল্পনা করেছি বহুকাল আগে থেকেই। বন্য ধূসর মন্থরগতির হাঁস (Grey lag goose) থেকেই আজকালকার পোষা হাঁসের উৎপত্তি এবং বন্য চীনা হাঁস থেকেই আজকের চীনা হাঁস। যদিও প্রধানত হাঁস, মাংসের জন্যই পালন করা হয় প্রায় সারা পৃথিবী জুড়ে তবু আমরা ভারতীয়রা হাঁসের মাংসের ভক্ত বড়ো একটা নই। হাঁসেদের একটা মহৎ গুণ—বছরের অধিকাংশ সময় চড়ে বেড়ায় ও ঘাস খেয়ে কাটায়। অবশ্য পাতিহাঁস (Duck) তা নয়। তারা জলে থাকতে ভালোবাসে। গেঁড়ি, শামুক, গুগলি ইত্যাদি খেতে ভালবাসে এবং এরা সম্ভবত পরে গৃহপালিত হয়েছে। প্রধানত ডিমের জন্যই এদের লালন-পালন করা হয়। এরা গতিতেও মন্হর এবং গৃহপালনের দরুন ওড়ার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। গ্রীক মিথে পাতিহাঁস আফ্রোদিতির সঙ্গে জড়িত। প্রিয়জন বোঝাতে 'ডাকী' (Duckie) শব্দটি বোধহয় এর থেকেই এসেছে। চীনদেশে এবং ভারতেই সম্ভবত পাতিহাঁস পালন প্রথমে শুরু হয়। সাধারণ ম্যালার্ড (Mallard) জাতীয় বন্য হাঁসই হয়তো পালিত পাতিহাঁসের আদিরূপ। পেরুতে একটি অন্য ধরনের পাতিহাঁস বহুকাল আগে থেকে গৃহপালিত হতে আরম্ভ করেছে, তার নাম 'মাসকোভি' (Muscovy)। এটা দক্ষিণ আমেরিকার হাঁস, মস্কোর নয়। কোনো কোনো ঋতুতে এর দেহ থেকে মৃগনাভির মতো (Musky) সুগন্ধ বের হয় বলে এর নাম 'মাসকোভি'।

কীট পতঙ্গ

গৃহপালনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু কীট-পতঙ্গের কথাও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। যেমন—রেশমকীট এবং মৌমাছি। রেশমকীটকে পরিপূর্ণ-

ভাবে গৃহপালিত বলা যায়। রেশমকীটের লার্ভা যত গুটি বাঁধতে থাকবে, পাক খেতে খেতে ততই সিল্ক তৈরী হবে এর শরীর থেকে। যখন এভাবেই পিউপা মূককীটে পরিণত হবে লার্ভা থেকে তখন মূককীটটিকে মেরে ফেলতে হয়। কিছু কিছু পিউপাকে রেখে দিতে হয় যাতে তারা পোকায় পরিণত হয় এবং ডিম পাড়ে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। এরা মালবেরির বা তুঁত গাছের পাতা খায়। চীন সম্রাট হুয়াং-তির (২৬৪০ খ্রী. পূ.) স্ত্রী শি লিং রেশমকীট প্রতিপালনের খুব পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন বলে জানা যায়। হাজার হাজার বছর ধরে চীনের অর্থনীতিতে ছিলো রেশমকীটের প্রাধান্য। সিল্কের রপ্তানী হতো প্রচুর। ৫০০ খ্রীস্টাব্দের কোনো সময়ে কনস্তান্তিনোপলে কিছু রেশমকীটের ডিম পাচার করা হয় চীন থেকে। তারপর থেকে ইউরোপে সিল্কের প্রসার হয়। স্পেন একসময় রেশমশিল্পে খুব নাম করেছিল বিশেষ করে মুরেরা। যখন ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাদের শেষ বংশধর গ্রানাডা ছেড়ে চলে যায়, তখন স্পেনের গরিমাও অস্তমিত হয়। কিন্তু পূর্বদেশে রেশমশিল্পের গরিমা, বিশেষ করে চীন এবং ভারতেও বহুদিন অক্ষুণ্ণ ছিলো। মুর্শিদাবাদী সিল্কের কদর, শুধু নবাবী আমলে নয়, এখনও। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলায় রেশম-কীট প্রতিপালন ও সিল্ক তৈরী অর্থনীতির একটা প্রধান দিক। অবশ্য রেয়ন, নাইলন ইত্যাদি সিনথেটিক ফেব্রিকের ব্যবহার শিল্পটিকে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

মৌমাছি

মৌ পালন, রেশমকীট পালনের থেকেও পুরোনো। ৩৬৩৩ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দের মিশরীয় হিয়ারোগ্লিফিক্সে মৌমাছি দেখানো আছে। পুরোনো সমস্ত সভ্যতাতেই মৌমাছির উল্লেখ পাওয়া যায়। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে হাঁস ও মৌমাছির উল্লেখ যে কত, তা অনুসন্ধানের বিষয়। ভার্জিল ও সিসেরোও মৌমাছির উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

হাজার হাজার বছর ধরে মধু ব্যবহৃত হয়ে আসছে মিষ্টত্বের জন্য। উপনিষদের শ্লোকে, বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে মধুর উল্লেখ আছে। আমাদের দেশের ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও যেমন মধু ব্যবহারের প্রাচুর্য, তেমনি গ্রীস বা পেরুর ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও মধুর প্রচুর ব্যবহার লক্ষণীয়।

নানা ধরনের মৌমাছি আছে। ইটালিয়ান, ককেশিয়ান মৌমাছিও আছে। মৌমাছিদের একটা বিশেষত্ব এই যে তারা নিজেদের দেশ থেকে অন্যদেশে স্থানান্তরিত হলে পালিত থাকতে চায় না, বন্য হয়ে যায়, নিজেদের কলোনী তৈরী করে নেয়। আজকাল অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড ও উত্তর আমেরিকায় মধুশিল্প খুব উন্নত। এসব দেশে মৌপালনকারী কলোনীর সংখ্যা তিন হাজারেরও কম হবে না এবং বাৎসরিক উৎপাদন প্রায় একলক্ষ টন।

বাহক প্রাণিকুল

এবার ভারবাহী গৃহপালিত পশুর কথা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ—ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, উট, লামা, হাতি ইত্যাদি।

(১) ঘোড়া ঃ এই ভারবাহী পশুদের মধ্যে ঘোড়াই বোধহয় সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। কখন ঘোড়াকে গৃহপালিত করা হয়েছিল সঠিক জানা যায় না। সম্ভবত তিন হাজার খ্রীস্টপূর্বাব্দের কোনো সময়ে—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ঘোড়া ব্যবহৃত হতো। সেখান থেকে পুরোনো পৃথিবীর সর্বত্র এরা ছড়িয়ে গিয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। প্রায় ২১০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের সময়ে হাম্মুরাবির ঐতিহাসিক লিপিতে ঘোড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাতে ঘোড়াকে বলা আছে, 'পূর্বদেশ থেকে আগত গাধা।' মিশরে ১৮শ' খ্রীস্টপূর্বাব্দের আগে এর উল্লেখ দেখা যায় না। ইউরোপে তারও পরে। দক্ষিণ ফ্রান্সের গুহাচিত্রে ঘোড়ার ছবি দেখা গেলেও তা গৃহপালিত ছিলো কিনা সন্দেহ থেকে যায়। সাধারণত তিনটি উৎস থেকে ঘোড়ার আদিপুরুষের উদ্ভব কল্পনা করা হয়। পশ্চিম ইউরোপের বন্য ঘোড়া, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার তার্পান ঘোড়া

এবং মঙ্গোলিয়ার 'প্রিজেওয়ালস্কি'র ঘোড়া [Przewalski's horse]। প্রথম প্রকারের ঘোড়াটি স্পেনে রোম সাম্রাজ্যের সময় পর্যন্ত দেখা যেতো। 'তার্পান' ঘোড়া দক্ষিণ রাশিয়ার স্তেপিতে গত শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত দেখা যেতো। শেষ 'তার্পান' ঘোড়াটিকে ১৮৮০ সালে গুলি করে মারা হয়েছিল। মঙ্গোলীয় বন্য ঘোড়াও এখন লুপ্ত প্রায়। সম্ভবত মিউনিক চিড়িয়াখানায় কিছু আছে। পুরোনো চীনা নথিপত্র থেকে বোঝা যায় পূর্ব এশিয়ার লোকেই ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছিল; তাও সম্ভবত মাংসের জন্য। মিশরে যখন ঘোড়ার আগমন ঘটেছিল তখন 'মেষপালক নৃপতি' হিকসোজ্‌দের (Hyksos) রাজত্ব। আগেই বলা হয়েছে, মেসোপটেমিয়ায় তার আগেই অর্থাৎ ২১০০ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দের আগেই ঘোড়া পেঁছিছিল। কাজেই ইসরাইলীরা যখন মিশর ছেড়ে অনন্ত যাত্রায় বের হয়, তার আগেই মিশরে ঘোড়ার ব্যবহার প্রচলিত হয়ে গেছিল। অথচ ইসরাইলীরা ঘোড়া নিয়ে বের হয়নি কেন ঠিক বোঝা যায় না, কারণ ডেভিডের রাজত্বের আগে প্যালেস্টাইনে ঘোড়া ঢোকেনি। ঘোড়াকে আরবদেশে জনপ্রিয় করিয়েছিলেন সলোমন। হিব্রু বা মুসলমানরা কিন্তু ঘোড়ার মাংস কখনই খায় না। ভারতে ঘোড়ার প্রচলন হয়েছিল হয়তো ১৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে। অর্থাৎ আর্যদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে। হয়তো ঘোড়া ও ঘোড়ায় টানা রথের গতিশক্তিই আর্যদের জয়লাভের অন্যতম কারণ ছিলো। কারণ, হরপ্পা সভ্যতায় ঘোড়ার ব্যবহারের নিদর্শন কিছু পাওয়া যায়নি সম্ভবত।

(২) **গাধা**: অনেকদিন যাবৎ ধারণা ছিলো, গাধার উৎপত্তি এশিয়াতেই। কিন্তু এখন মোটামুটিভাবে মেনে নেওয়া গেছে নুবিয়ার বন্য গাধা থেকেই গৃহপালিত গাধার উৎপত্তি। উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় নিওলিথ পর্বে হয়তো প্রথম গৃহপালন শুরু হয় গাধার। হিব্রুরা গাধা ব্যবহার করতো খুব বেশি এবং তারাই বোধহয় এশিয়া মাইনরের মধ্য দিয়ে গাধাকে ইউরোপে চালান করে। এরা ঘোড়ার চেয়েও আগে গৃহপালিত হয়েছিল। ভারত মহাসাগরের পূর্বদিকের দেশগুলিতে

পুরাকালে সপরিবারে স্থানান্তরে যাওয়া হতো গাধায় চেপে। গাধার মাংস খাওয়ার কথা অবশ্য শোনা যায় না। কর্মী পশু হিসাবেই এর কদর। ভারবহন ও গতির ক্ষেত্রে ঘোড়া ধীরে ধীরে গাধাকে পিছু হটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু উত্তর ও মধ্য আফ্রিকায় এখনও গাধার প্রচলন খুব বেশি। গাধাকে আমরা অযথা উপহাস করি; এর গতি শ্লথ, কিন্তু ঘোড়ার চেয়ে গাধা বেশি নিশ্চিতপদ। ঘোড়ার চেয়ে গাধা উচ্চতায় ছোট। গাধার উচ্চতা ৩ থেকে ৫ ফুট পর্যন্ত। অবশ্য পারস্য দেশে একপ্রকার উঁচু উঁচু গাধাও পাওয়া যায়। পুরুষ গাধা ও মেয়ে ঘোড়ার মিলনের ফলে এক ধরনের গৃহপালিত প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই। তাদেরই বলা হয় 'মিউল' বা 'খচ্চর'। এই শংকর প্রজাতিটির শক্তি ও উচ্চতা ঘোড়ার মতো হতে পারে। গাধার মতো ধীর, ধৈর্যশালী ও নিশ্চিতপদ হতে পারে এরা। গ্রীক ও রোমানেরা খচ্চর ব্যবহার করতো খুব বেশি।

(৩) উট ঃ প্রজাতিটি জীববিদ্যার একটি সমস্যাস্বরূপ। প্রায় ৩০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের উচ্চ-মিশরের ছবিতে উট দেখা যায়। অর্থাৎ প্রথম পিরামিড তৈরী হবার আগের থেকেই উট জানা ছিলো মানুষের। আরো প্রায় হাজার বছর পরে আব্রাহাম দৃশ্যপটে আসেন। তিনি গাধা, ভেড়া এবং উটকে বাহকপ্রাণী হিসাবে ব্যবহার করতেন। বস্তুতপক্ষে নিকট প্রাচ্য এবং ইসরাইলে উটই ছিলো প্রধান বাহকপ্রাণী। কীভাবে উটের প্রতিপালন শুরু হয় সে সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র পাওয়া যায়নি। এখন যে দু ধরনের উট দেখা যায়, তাদের আদিপুরুষ একই কিনা তাও জানা যায় না সঠিক। এককুঁজযুক্ত উট বা আরবীয় উট দ্রুত ভ্রমণের জন্য ব্যবহৃত হয়। আরেক প্রকারের উট আছে যাদের দুটি কুঁজ। এদের ব্যাকট্রিয় উটও বলা হয়। এই কুঁজের পার্থক্য ছাড়া এদের শরীর-তত্ত্বে আর কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। এরকম একটা মত প্রচলিত আছে, আরবীয় এককুঁজ উট বহুকাল ধরে উত্তর আফ্রিকা এবং নিকট প্রাচ্যে ছিলো এবং ব্যাকট্রিয় দু-কুঁজ উট

ছিলো মধ্য এশিয়ায় ঠাণ্ডা জায়গায়। কেউ কেউ আবার বলেন, দুপ্রকার উটই এক আদিপুরুষ থেকে উৎপন্ন। ঐতিহাসিক জ্ঞাতকালের মধ্যে এক কুঁজ উটের বন্য রূপ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায়নি। তবে গোবি মরুভূমিতে দুকুঁজ অগৃহপালিত উট কিছু কিছু দেখা গেছে। তবু এগুলিও যথার্থ অগৃহপালিত কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ থেকেই যায়। কারণ কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিব্বতীয়রা ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে পোষা উটকে ছেড়ে দিতো। আরবীয় উট উত্তর আফ্রিকা ও নিকট প্রাচ্যের মরুভূমিতে, এমনকি উত্তর অস্ট্রেলিয়াতেও ব্যবহৃত হয়। মরুভূমির মাতা খরাপ্রবণ এলাকায় যেখানে অন্য ভারবাহী পশু কাজ করতে পারে না, সেখানে উটের ব্যবহার সর্বজনবিদিত। সাধারণ ভাবে একটি উট চার হন্দর (4 cwt) পর্যন্ত ভার বহন করে হাঁটতে পারে। কিন্তু সিনাই মরুভূমির মতো স্থানে এর অর্ধেক চাপানো হয়। যদি ভালোভাবে খাওয়ানো হয়, তাহলে একটি উট দিনে ৬০/৭০ মাইল পর্যন্ত হাঁটতে পারে। ব্যাকট্রিয় উট মধ্য এশিয়ার ঠাণ্ডা জায়গায় ব্যবহৃত হয় এবং গোবি মরুভূমিতে পারাপারের জন্য ব্যাকট্রিয় উটের ক্যারাভ্যানই ব্যবহৃত।

উটেরা শুধু যে ভারবাহী বাহকপ্রাণী তাই নয়। আদিকাল থেকেই উট দুধ দেয়, মাংসের যোগান দেয়। একটি উট দু বছর ধরে দুধ দিতে পারে একটানা—প্রথম দিকে দৈনিক দু-গ্যালন। কমতে কমতে শেষের দিকে দৈনিক আধ গ্যালনের কিছু কম। উটের লোমও কাজে লাগে। একটি উট থেকে ৪/৬ পাউণ্ড পর্যন্ত লোম পাওয়া সম্ভব। উটের বিষ্ঠা মরুভূমিতে জ্বালানি হিসাবে কাজে লাগে। সাধারণের ধারণা উট কুঁজের মধ্যে জল ধরে রাখে। তা নয়, ধরে রাখে খাবার। জলও ধরে রাখে অবশ্য, তবে সেটা পাকস্থলীর পাশে ছোট ছোট চামড়ার থলির মধ্যে। ভূতাত্ত্বিক রেকর্ড থেকে জানা গেছে, উটের পূর্বপুরুষদের আগে পৃথিবীর বহু জায়গায় দেখা যেতো। এমনকি নব্য পৃথিবীতেও, প্লিসটোসিন অন্তর্যুগেও। কিন্তু এখন সেখানে তাদের জীবিত আত্মীয় কিছু কিছু দেখা যায়। যেমন দক্ষিণ আমেরিকার লামা।

(৪) লামা ঃ পুরোনো পৃথিবীর উটদের সমগোত্রীয় দূর সম্পর্কিত আত্মীয় লামা। অবশ্য অনেক ছোট এবং কুঁজবিহীন। উটের মতোই অগম্যস্থানে এদের নিবাস ও যাতায়াত। যেমন আণ্ডিস পর্বতের ১২০০০ ফিট উঁচু ঢাল। চার ধরনের লামার কথা জানা যায় ঃ (১) বন্য হুয়ানাকো ও তার থেকে গৃহপালিত (২) লামা (৩) বন্য ভিকুনা ও তার থেকে গৃহপালিত এবং (৪) আলপাকা। উঁচু ঠাণ্ডা অঞ্চলে লামাই একমাত্র ভারবাহী প্রাণী। অবশ্য এক হন্দরের কম ওজন এরা বইতে পারে এবং দৈনিক ১৪ মাইল পর্যন্ত হাঁটতে পারে। লামা দুধ দেয়, মাংসের যোগান দেয় এবং উলও দেয়। উলের জন্য প্রধানত আলপাকার ব্যবহারই বেশি।

(৫) হাতি ঃ এবার বর্তমান পৃথিবীর সর্ববৃহৎ স্থলচর প্রাণী হাতির কথা। ভারতবর্ষের ও ব্রহ্মদেশের জঙ্গল এদের প্রধান বাসভূমি। হাতির অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তাও অসাধারণ। যে সমস্ত কাজে যন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না, সেসব কাজ হাতির সাহায্যেই সম্পন্ন করা হয়। যেমন—পাহাড়ী জঙ্গল এলাকায় কাঠের কাজ। বড় বড় কাঠের গুঁড়ি টানা, ঠেলা এবং মূল্যবান সেগুন গাছের কাজকর্মে হাতির সাহায্য লাগে। শিকারীরা হাতিতে চেপে শিকারে যেতেন এবং জঙ্গলে বাঘ বা লেপার্ড শিকার করতে গেলে হাতি অপরিহার্য ছিলো। এতৎ সত্ত্বেও হাতিকে গৃহপালিত পশু বলা যাবে কিনা সন্দেহ, যদিও আগে ভারতীয় জমিদারেরা হাতি পুষতেন। হাতি পোষা তখন একটা মর্যাদার ব্যাপার ছিলো প্রাচ্যদেশে। যুদ্ধক্ষেত্রেও হাতি ব্যবহৃত হতো। ভারতবর্ষে হাতির ব্যবহার বহু শতাব্দী ধরে। বৌদ্ধ জাতকের বিখ্যাত হাতির গল্প সকলেরই জানা। ভারতের বহু প্রাচীন চিত্রশিল্পেও হাতির ছবি। খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে হানিবল, যুদ্ধক্ষেত্রে হাতির ব্যবহার করেছিলেন। অনেকে মনে করেন, এগুলি এশিয়ার হাতিই ছিলো, কারণ আফ্রিকার হাতিকে পোষ মানিয়ে কাজ করানো যায় না। ইউরোপে, বিশেষ করে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে হাতির প্রচলন ভারত থেকেই হয়েছিল সন্দেহ নেই, যদিও মিশরীরা বা রোমানেরা পরবর্তীকালে আফ্রিকা থেকেই হাতি সংগ্রহ করতেন। ডায়োনিসাসের সম্মানে যে মিছিল বের করা হয়েছিল তাতে ৯৬টি হাতি রথ টেনেছিল, এক একটি রথে চারটি করে। এখন

হাতির সংখ্যা এত দ্রুত কমে গেছে যে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের চিড়িয়াখানাগুলিতে সম্ভবত ৯৬টি হাতিও নেই। সার্কাসেও হাতি ব্যবহৃত হয়। হাতি দৈনিক প্রায় ১৫০ পাউণ্ড পর্যন্ত ঘাস পাতা বিচালী খেতে পারে এবং ৫০ গ্যালন জল। সেজন্য হাতি পোষার খরচও অনেক। এরা টানা আট ঘণ্টা কাজ করতে পারে, আবার আট ঘণ্টা বিশ্রামও নেয়। হাতির দাঁত খুব মূল্যবান। মূল্যবান হাতির দাঁতের ব্যবসায়ের জন্য হাতি শিকার করা হয়, হাতি মেরে ফেলা হয় প্রচুর। মানুষের হাতে মরতে মরতে হাতি এখন বিলুপ্তির পথে।

ভারতবর্ষে ধর্মীয় সংস্কারে হাতির উল্লেখ প্রচুর। দক্ষিণ ভারতের প্রধান দেবতা গণেশের মাথাটি হাতির। দক্ষ প্রজাপতির অবশ্য ছিলো ছাগমুণ্ড। এ রকম পশু-মানব মিশ্রিত আকৃতির দেবদেবী প্রাচীন মিশরীয় দেবদেবীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মিশর থেকে প্রভাবটি এখানে বিস্তার লাভ করেছিল কিনা এবং করলে কীভাবে করেছিল, অনুসন্ধানের বিষয় হতে পারে। আমাদের বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের বাহনও হাতি।

সহচর অন্যান্য প্রাণী

সহচর প্রাণীদের মধ্যে আরো দু/একটি প্রাণীর কথা বলা যেতে পারে। যেমন—বিড়াল, পায়রা, ময়ূর, গিনিপিগ ইত্যাদি। কুকুরের কথা আগেই কিছুটা বলা হয়েছে।

(১) পায়রা : গৃহপালিত পায়রার ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। পায়রা শান্তির প্রতীক। মিশরীয়দের রাজত্বকালের প্রাপ্ত রেকর্ডে পায়রার উল্লেখ আছে। চতুর্থ সাম্রাজ্যের সময়ে ৪০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে পায়রাকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। পায়রা যে প্রথমে খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতো তাতে কোনো সন্দেহই নেই ; দেবতার স্থানে বলিপ্রদত্ত হতো। পরে অন্যান্য প্রয়োজনে, যেমন—সংবাদ পাঠানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো। প্রাচীন মিশরীয়রা সংবাদ পাঠানোর কাজে পায়রার ব্যবহার তো করতই, গ্রীকরাও বোধহয় এরকম ব্যবহারের কথা জানতো। কারণ টৌউরোসথেনিস নামক এক ব্যক্তি অলিম্পিক খেলার খবরাখবর পাঠাতো বাড়িতে। ভারতবর্ষে, বিশেষ করে এই কলকাতা

শহরে, ঊনবিংশ শতাব্দীতেও পায়রা ব্যবহৃত হতো এই ধরনের কাজে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাবুরা পায়রা পুষতেন খুব বেশি, পায়রার খেলা হতো। সংবাদ পাঠানোর কাজে পায়রা ব্যবহারের শ্রেষ্ঠ রেকর্ড বোধহয় ৭৮ খ্রীস্টপূর্বাব্দে মোডেনা অবরোধ। মুক্ত সেনাদলের অধিনায়ক পায়রা মারফত খবর পাঠিয়েছিলেন। পৃথিবী-বিখ্যাত সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান রয়টার (Reuter) পায়রার মাধ্যমে সংবাদ সরবরাহ শুরু করেছিলেন এবং এখনও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওয়্যারলেসের পরিবর্তে পায়রা ব্যবহার করেন তাঁরা। রোমানরাও প্রচুর পায়রা পুষতেন। সময় সময় পায়রাদের জন্য বিশেষ বাড়ি তৈরী হতো, তাতে ৫০০০ পর্যন্ত পায়রা থাকতো।

(২) ময়ূর ঃ ময়ূর ভারতীয় পাখি। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই ময়ূর পালিত হয়ে আসছে ভারতবর্ষে। সেই আদিকালেই ভারত থেকে পেঁছেছিল পশ্চিম এশিয়াতে এবং রাজা সলোমন ১০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে ময়ূরের কথা জানতেন। এথেন্সে ময়ূর পেঁছেছিল সম্ভবত ৪৫০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে। আলেকজাণ্ডার পূর্বদেশ থেকে সম্ভবত ময়ূর নিয়ে গেছিলেন। কিন্তু তার আগেই ময়ূর ইউরোপে পেঁছেছিল। রোমানেরা অবশ্য প্রচুর ময়ূর পুষতেন সাধারণত খাবার জন্যই। ভারতবর্ষে ময়ূর আদিবাসীদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলো। আফ্রিকার আদিবাসীরা যেমন অস্ট্রিচের পালক ব্যবহার করতো, ভারতের আদিবাসীরা ব্যবহার করতো ময়ূরের পালক। চর্যাপদে আছে 'উঁচা উঁচা পবত তঁহি বসতি শবরী বালী/মোরঙ্গ পিচ্ছ পরহিন গিবত গুঞ্জরী মালী।' আমাদের লোকদেবতা কৃষ্ণের মাথায় ময়ূরপাখা তো উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

(৩) গিনিপিগ ঃ আজকাল এই ভারতেও অনেকে গিনিপিগ পোষেন। যদিও ওষুধের কারখানায় নানান ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যই গিনিপিগ ব্যবহৃত হয় বেশি। এদের অত্যধিক প্রজনন ক্ষমতার জন্যই হয়তো গিনিপিগের এই ব্যবহার। নাম থেকে মনে হয় যেন এরা পশ্চিম আফ্রিকা থেকে আগত। আসলে গিনিপিগ দক্ষিণ আমেরিকা থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়েছে। পেরুভিয়ানরা, স্পেনীয়দের দ্বারা বিজিত হবার আগেই, গিনিপিগ পালন করতে শিখেছিল। ইংলণ্ডে মাত্র ১৭৫০ সালে গিনিপিগ প্রবেশ করেছে। ইনকারা হয়তো বলিদান

বা খাবার জন্য গিনিপিগ ব্যবহার করতো। এখনো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় খাবার জন্যই গিনিপিগ ব্যবহৃত হয়। পশ্চিম আফ্রিকাতেও। সেখানে একে "লাগোস ইঁদুর" বলা হয়। পালিত প্রাণীর ক্ষেত্রে গিনিপিগ নতুন সংযোজন।

(৪) চিতা : সবচেয়ে দ্রুতগামী প্রাণী চিতা। ভীষণ দৌড়বাজ। বহু শতাব্দী ধরে ভারতীয় রাজা মহারাজারা শিকারের পেছনে ধাওয়া করার জন্য চিতা পুষতেন। এরা বিড়াল শ্রেণীর প্রাণী। কুকুরের কিছু কিছু বিশেষত্ব এদের মধ্যে আছে। খুব অল্পবয়সে ধরা পড়লে এরা সম্পূর্ণ পোষ মানে ও শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। এতৎ সত্ত্বেও এরা কোথাও বন্দী অবস্থায় শাবকের জন্ম দিয়েছে বলে জানা যায় না।

(৫) গন্ধগোকুল : গন্ধগোকুলও এ প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবী রাখে। এর ইংরেজী নাম Civet cat। আফ্রিকাতে, বিশেষ করে নাইজিরিয়াতে এবং আবিসিনিয়াতে এদের পালন করা হয়। এদের পিছনের গ্রন্থি থেকে এক রকমের নির্যাস নির্গত হয়, যার জন্যই এদের কদর। ঐ নির্যাস থেকে মৃগনাভির মত গন্ধ নির্গত হয়। ঐ নির্যাস সেণ্টের মতো ব্যবহার করা যায়। চামচ দিয়ে ঐ রস ধরে রাখা হয়। গন্ধগোকুলকে ভালোভাবে খাওয়ালে, সপ্তাহে প্রায় এক আউন্স গন্ধরস শরীর থেকে নির্গত করতে পারে। গন্ধগোকুল বন্য অবস্থাতেই ধরা হয়। এরাও বন্দী অবস্থায় শাবকের জন্ম দিতে পারে না। সকলেই যে আবার ঐ গন্ধ পছন্দ করে তাও নয়। গোল্ড কোস্টের লোকেরা একেবারেই পছন্দ করে না। তাদের ভাষায় তারা গন্ধগোকুলের যে নাম দিয়েছে তার অর্থ করলে দাঁড়াবে 'দুর্গন্ধগোকুল'।

(৬) বিড়াল : সবশেষে বিড়ালের উপাখ্যান। অনেকে মনে করেন যে মিশরীয় সভ্যতার শুরুর সঙ্গে সঙ্গে বিড়ালেরও আবির্ভাব। কিন্তু বিড়ালের অস্তিত্বের প্রমাণ তার আগেও পাওয়া গেছে। এটা অবশ্য ঠিক যে বিড়ালের গৃহপালিত রূপটি মিশরীয় সভ্যতারই অবদান। সম্ভবত এই প্রজাতিটি একমাত্র প্রজাতি যা দলবদ্ধভাবে কোনো দিন ছিলো না বা থাকেও না। গৃহপালিত বিড়ালের আদিপুরুষ—উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার বন্য বিড়াল। হয়তো আরো অন্য ধরনের বনবিড়াল

গৃহপালিত বিড়ালে রূপান্তরিত করা হয়েছে। যেমন, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বনবিড়াল বা ইউরোপীয় বনবিড়াল। ইউরোপীয় বনবিড়াল ও গৃহপালিত বিড়াল থেকে সংকরজাতীয় বিড়ালের জন্ম দেওয়া সম্ভব হয়েছে। নিশ্চিত করে আমরা কিছু বলতে পারি না, তবে মনে হয়, ইঁদুরের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই হয়তো বিড়ালের গৃহপ্রবেশ শুরু হয়েছিল মিশরে। মিশর ছিলো প্রাচীন পৃথিবীর শস্যাগারের মতো, বহুকাল ধরে। কিছু কিছু পুরোনো রেকর্ডে বিড়ালের ইঁদুর মারার ছবিও দেখা যায়। মনে হয়, মিশরের পুরোহিতেরা প্লেগের সঙ্গে ইঁদুরের একটা সম্পর্ক নির্ণয় করতে পেরেছিলেন। সেজন্যই হয়তো, ইঁদুরের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই, বিড়ালকে তাঁরা দেবতার আসনও দিয়েছিলেন। পুরোনো মিশরে বিড়ালকে বাস্তবিকই পবিত্রতম প্রাণীর সম্মান দেওয়া হতো। সম্ভবত এজন্যই হিব্রুরা বিড়ালকে অভিশপ্ত প্রাণী মনে করতো। পুরোনো রেকর্ডপত্র থেকে মনে হয়, খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর আগে, বিড়াল নীল উপত্যকা ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েনি। রোমানেরাই প্রথমে ইউরোপে গৃহপালিত বিড়াল আমদানী করেছিল। সম্প্রতি কেন্টে একটা বাড়িতে দ্বিতীয় শতাব্দীর গৃহপালিত বিড়ালের অবশেষ পাওয়া গেছে। হয়তো বড় লোকেরাই তখন বিড়াল পুষতেন। নবম শতাব্দীর আগে সর্বসাধারণের ঘরে বিড়াল ঢোকেনি বলেই মনে হয়। পরবর্তীকালে ইউরোপে ডাকিনী বিদ্যার সঙ্গে যুক্ত করার ফলে একদা বিড়ালদের সেখানে খুব দুঃসময় গেছে। অনেকে মনে করেন, বিড়ালের বিরুদ্ধে এরকম অভিযানের ফলেই, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডে, ইঁদুরের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং প্লেগ একসময় সেখানে মহামারীর আকার ধারণ করে। শারীরিক বিবর্তন বিড়ালের খুব কমই হয়েছে তবে নানা রঙের বিড়ালের জন্ম হয়েছে ক্রমশ। বন্দী অবস্থায় বিড়ালের খাদ্যাভ্যাস পাল্টে যায় এবং গেছেও। দুধ ও মাছের প্রতি বিড়ালের আসক্তির কোনো কারণ বোঝা যায় না। তেমনি বোঝা যায় না এরা জলে ভিজতে একেবারেই অপছন্দ করে কেন। গৃহপালিত বিড়াল সহজেই বন্য হয়ে যেতে পারে। অস্ট্রেলিয়ানরা এবং নিউজিল্যাণ্ডাররা এটা খুব ভালো জানে। আজকাল বিড়াল পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। মিশরে পুরোনো জিনিস খুঁজে বের করতে কুকুর

নয়, অনেক সময় বিড়াল ব্যবহার করা হতো। আজকাল বিড়ালরা ইঁদুর ধরতেও ভুলে যাচ্ছে। বিড়ালদের অধিকতর আনুগত্য স্থানের প্রতি, মালিকের প্রতি ততটা নয়। কুকুরের ঠিক উল্টো।

বিড়ালকে, মানুষের ভালোবাসার দায় যেমন স্বীকার করে নিতে হয়েছে, তেমনি নিতে হয়েছে ঘৃণার ভাগও। বেশ ভীষণ রকম ভাবেই। মিশরের পুরোহিতেরা বিড়ালকে যেমন দেবত্ব আরোপ করেছিলেন প্লেগের উৎপাত থেকে উদ্ধার কর্তা হিসাবে, তেমনি সন্তান প্রসবের দেবতারূপেও বিড়ালকে মিশরীরা দেখতেন, যেমন আমরাও দেখি মা ষষ্ঠীর বাহনরূপে। মিশরের পুরোহিতেরা একে চন্দ্রের দেবীও মনে করতেন। বিড়ালদের জন্য বড় বড় মন্দির বানানো হয়েছিল। সেখানে বিড়ালকে ভালো ভালো খাবার খেতে দেওয়া হতো। বিড়ালদের পুরোহিত ও ভক্তের দল ছিলো। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের মতে বুবাসতিস শহরের বিড়ালমন্দিরে যে উৎসব হতো, তাতে অন্তত সাত লাখ ভক্ত যোগদান করতো। তারা সোনার কিংবা রুপোর কিংবা ব্রোঞ্জের বিড়াল মূর্তি তৈরী করে উপহার দিত এই দেবীর কাছে। ফলত, প্রচুর খাবার পেয়ে অলস বিড়ালেরা মিশরে শেষ পর্যন্ত ইঁদুর ধরতেই ভুলে গেছিল। পুরোহিতেরা চন্দ্রদেবীর সঙ্গেই যে কেবল বিড়ালের সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছিলেন তাই নয়, চন্দের ভাই সূর্যদেবতা 'রা'র সঙ্গেও বিড়ালের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। সূর্যের সঙ্গে মেলবন্ধনের অনেক চিহ্নের মধ্যে ছিলো তাদের চোখ। সূর্য দিনে যতই উজ্জ্বলতা বাড়াতে থাকে, বিড়ালের চোখের তারা ততই ছোট হতে থাকে। আবার সূর্য অস্ত গেলে এবং অন্ধকার নেমে এলে বিড়ালের চোখের তারা দুটি ক্ষুদে সূর্যের মতন জ্বলতে থাকে। সুতরাং এ ধরনের জীবকে শুধু পুজো করলেই হবে না, যথারীতি রক্ষণাবেক্ষণও করতে হবে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, বাড়িতে আগুন লাগলে, অন্য ব্যবহার্য বস্তুর রক্ষার চেয়ে, পোষা বিড়াল রক্ষা করাই মিশরীয়দের প্রধান ভাবনা ছিলো। এমন গল্পও প্রচলিত আছে যে মিশর পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গেছিলো শুধু বিড়ালের জন্যই। পারস্য সম্রাট কামবিসেস (Cambyses) মিশর আক্রমণের সময় তাঁর সৈন্যদের হাতে একটা করে পোষা বিড়াল ধরিয়ে দিয়েছিলেন। মিশরীয়রা স্বভাবতই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

কারণ, একজন পারসিক সৈন্যকে হত্যা করা মানেই একটি বিড়াল হত্যা করা! তা কি কখনও একজন মিশরীয়ের পক্ষে সম্ভব? কেউ বিড়াল মেরে ফেললে জনসাধারণের ক্রোধে তার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারতো। এমনকি ফারাও পর্যন্ত তাকে রক্ষা করতে পারতেন না। যদি কোনো বাড়িতে বিড়াল মারা যেতো তাহলে ভুরু কামিয়ে চুল কেটে মালিককে শোকপালন করতে হতো। সোনা ও রুপোর তৈরী বাক্সের মধ্যে ভরে মৃত বিড়ালকে কবর দেওয়া হতো, বিশেষ বিশেষ কবরখানায়। বেনি হাসানের কাছাকাছি এরকম একটি বিড়ালের কবরখানা আবিষ্কৃত হয়েছে, যাতে ১৮০ হাজারেরও বেশি বিড়ালকে কবর দেওয়া হয়েছিল। কাজেই বহু শতাব্দী ধরে মিশরে বিড়ালেরা খুব সুখেই ছিলো। এমনকি যখন মানুষ পুরোনো সংস্কার/সংস্কৃতির কথা ভুলতে বসেছে এবং ইসলাম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তখনও আরবীয় ভাষায়, আরবীয় সংস্কৃতিতে, বিড়ালকে পবিত্র প্রাণী বলেই মনে করা হতো। যেমন, ১৩শ খ্রীস্টাব্দে সুলতান এল-দাহের-বেবারস্ (El-Daher-Beybars) বিড়ালের জন্য কায়রোর কাছে এক মনোরম উদ্যান তৈরী করেছিলেন। এখানে বিড়ালেরাই থাকতো এবং এই উদ্যান থেকে যা রোজগার হতো, সবটুকু যেতো বিড়ালের খাদ্য সংগ্রহে। দক্ষিণ ইউরোপে, পুরোনো গ্রীসে ও রোমে, বিড়ালকে স্বাধীনতার প্রতীক মনে করা হতো। সম্ভবত এখনও ইংরেজ নাবিকেরা মনে করে, জাহাজে কালোবিড়াল দেখা গেলে তা সৌভাগ্যের প্রতীক। ইয়র্কশায়ারের উপকূলভাগের বাসিন্দারা মনে করে, কালো বিড়াল বাড়িতে থাকলে সমুদ্র যাত্রায় কোনো বিপদ হয় না। ইংলণ্ডে কালো বিড়ালকে রাস্তা পার হতে দেখা শুভ লক্ষণ। কিন্তু রাশিয়াতে অশুভ। ইংলণ্ডে হঠাৎ যদি বিড়াল বাড়িতে ঢোকে ভালো খবর; বা কোনো বিয়ের সময় কনের কাছে হেঁচে ফেললে বিয়েটা শুভ। রাশিয়াতেও এরকম সংস্কার ছিলো। এমনকি কালো বিড়ালও শুভ লক্ষণ বলে মনে করা হতো। নানা অদ্ভুত অদ্ভুত কুসংস্কার ছিলো সেখানে। যেমন, বিড়ালের হাঁচির সঙ্গে সঙ্গে যদি কাউকে 'ভালো থাকো' ব'লে আশীর্বাদ করা যেতো তাহলে তার সারা জীবন দাঁতের যন্ত্রণা হবে না বলে বিশ্বাস করা হতো। বিড়ালে মুখ মুছলে অতিথি আসতো ঘরে, যদি থাবা আঁচড়াতো আবহাওয়া খারাপ হতো। এসব

কিন্তু বিড়ালের আগের জমানা। বিড়াল তখন সমগ্র ইউরোপেই বহাল তবিয়তে থাকতো। পরে তাদের অবস্থা সত্যিই খারাপ হয়ে গেছিল।

এখনও ইউরোপে কালো বিড়ালকে অশুভের প্রতীক মনে করা হয়। মধ্যযুগে ইউরোপীয় চার্চ প্রাচ্যের প্রাণিপূজার বিরোধী ছিলো। তখন ইউরোপে প্রাণিপূজার বিরুদ্ধে সবরকম ব্যবস্থাই নেওয়া হতো। শয়তান বা ডাইনীর প্রতীক মনে করে অনেক বেড়াল মারা হয়েছিল সে সময়। কারণও অনেক তাঁরা পেয়েছিলেন বৈকি! তারা রাত্রে কোথায় যায়? তারা চুপিসারে চলে কেন? কেন অন্ধকারে তাদের চোখে আগুন দেখা যায়? ওটা কি নরকের আগুন? এ সবের উত্তর ছিল চার্চের কাছে, "হ্যাঁ, ওরা শয়তানের সহচর"। তাছাড়া ডাইনীরা কি বিড়ালের খাবার বানায় না? খায় না? অতএব বিড়ালকে, বিশেষ করে কালো বিড়ালকে এবং তাদের সঙ্গী ডাইনী মেয়েদের পুড়িয়ে মারার পালা শুরু হয়েছিল মধ্যযুগের ইউরোপে। জীবন্ত পোড়ানো হতো মেয়েদের, বিড়ালদেরও। অনেক জায়গায় উচুঁচূড়া থেকে ফেলে মারা হতো বিড়ালদের। নেদারল্যাণ্ডে ছিলো 'Cat wednesday'। সেদিন বিড়াল ধরে ধরে মেরে উৎসব পালন করা হতো। এই হলো বিড়ালদের নাটকীয় ইতিহাস। কখনো দেবতা, কখনো ডাইনী। কখনও প্রিয়, কখনও ভয়ংকর ঘৃণ্য। গল্পের চেয়েও হৃদয়স্পর্শী।

(গ) প্রাণী সম্পর্কিত অন্যান্য কয়েকটি সংস্কারঃ পুরোনো গ্রীসে বা রোমে প্রাণীদের সম্পর্কে বহু গল্পকথা (Legend) গড়ে উঠেছিল। যেমন রোমানেরা বিশ্বাস করতো জুপিটার ষাঁড়ের রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে এসেছিলেন। বহু গ্রীক ও রোমান দেবতার প্রতীক কোনো না কোনো প্রাণী। যেমন, জুপিটারের প্রতীক ঈগল, জুনো বা হেরার প্রতীক ময়ূর, মিনার্ভা বা এথেনার প্রতীক পেঁচা। আমাদের লক্ষ্মীর প্রতীক পেঁচা এবং গণেশের বাহন ইঁদুর। আবার কার্তিকের বাহন ময়ূর। ভেনাস বা আফ্রোদিতির প্রতীক ঘুঘু। নেপচুন বা পসিডনের প্রতীক ঘোড়া। ইসকিউলোপিয়াসের প্রতীক সাপ। আমাদের লোকদেবী মনসার প্রতীকও সাপ। এ সবই অবশ্য ভালোবাসার কথা, প্রাণীতে দেবত্ব আরোপের বা দেবতাতে প্রাণীত্ব আরোপের কথা। প্রাণীকে

ঘৃণার কথা নয়। আমরা আগেও মিশরে এধরনের প্রাণীতে দেবত্ব আরোপের কথা আলোচনা করেছি।

গৃহপালিত নয় এমন কিছু প্রাণী সম্পর্কে মানুষের সংস্কারের কথা বলা যেতে পারে। আবার মিশরের কথাতেই ফিরে আসতে হবে আমাদের। 'এপিস্ বুলের' (Apis bull) কথা আগেই বলা হয়েছে। কুকুরের কথাও বলা হয়েছে। এখন বাজপাখি, বেবুন, গুবরে পোকা (Scarabaeus বা Scarab Bettle) ও কুমীরের বিষয়ে সংস্কারের কথা বলা যেতে পারে। আইবিস নামক একপ্রকারর মিশরীয় সারসজাতীয় পাখির কথাও এ প্রসঙ্গে এসে পড়ে। এরা প্রচুর পোকামাকড় খেয়ে ফসল রক্ষা করতো। এরা সাপও মারতো বলে মনে করা হতো। সুতরাং মিশরীরা আইবিসের পূজা করতো। বাজপাখির পূজো হতো মিশরে, সম্ভবত তারা পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে সাহায্য করতো বলে, গলিত পচা মাংসভোজী বা শবাহারী বলে শৃগালেরও খুব কদর ছিলো। তাকে এজন্য একটি উপাধিও দেওয়া হয়েছিল মিশরীয় ভাষায়, যার অর্থ "দিগন্তের পাহারাদার" (Keeper of the horizon)। আবার প্রচুর পরিমাণে ফসল নষ্ট করলেও, বেবুনকে খুব সম্মান দেওয়া হতো। কারণ কী সঠিক বোঝা যায় না। হয়তো কুকুরের সঙ্গে সাদৃশ্য। হয়তো শিকারী প্রাণীদের হাত থেকে কোনো এলাকাকে সাবধান করতে পারতো বলে। হয়তো মনে করা হতো যেখানে বেবুন থাকে সেখানে লেপার্ড বা সিংহ জাতীয় প্রাণীরা সচরাচর আসে না। হয়তো মনে করা হতো, কোনো জায়গায় জলাভাব হলে, বেবুনেরা ঠিক কোথায় জল আছে খুঁজে বের করতে পারে। নানা কারণই হতে পারে।

গুবরে পোকা বা পবিত্র স্ক্যারাবের কথা খুবই মজার। মিশরীয়রা দেখতো এই পোকাগুলি তাদের নিজেদের আকারের চেয়েও অনেক বড় বড় গোবরের গোলা বা তাল ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। মিশরীয়রা খুব পরিশ্রমী বলে এ ব্যাপারটা তাদের খুব ভালো লাগতো। তাছাড়া মিশরী পুরোহিতেরা দেখতেন যে গুবরে পোকার বাচ্চাগুলো গোবরের গোলা থেকে হঠাৎ নির্গত হচ্ছে। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে অন্য প্রাণীদের মতো এদের বাচ্চা কোনো স্ত্রীজাতি থেকে হয় না বা ডিম থেকেও হয় না। ময়লার গাদা থেকে এরা জন্মায় নিজে নিজেই। অর্থাৎ এরা স্বয়ম্ভু।

গোলাটি পরীক্ষা করলে তাঁরা তার মধ্যে স্ক্যারাবের ডিম দেখতে পেতেন। সেই ডিম থেকে কীভাবে লার্ভা তৈরী হয় আর তারপর লার্ভা কীভাবে পোকায় পরিণত হয়, একটু অনুসন্ধিৎসু হলেই তাঁরা বুঝতে পারতেন। কিন্তু তখন পোকামাকড়ের জীবন নিয়ে গবেষণা বা তথ্যনিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসা একেবারেই ছিলো না। পুরোহিতেরা, স্ক্যারাবদের হঠাৎ আবির্ভাবকেই শুধু নয়, তাদের পায়ের তিরিশটা আঙুলকেও প্রতীকী মনে করতেন, কারণ তাঁরা দেখেছিলেন এবং অনুভব করতে পেরেছিলেন তিরিশ দিনের মাস-পর্যায়টি। তাঁরা এজন্য গোবরের তালকেও সূর্য দেবতার সঙ্গে তুলনা করতেন। সুতরাং স্ক্যারাব পূজো পেতো মিশরে। এগুলোকে মমি করে মানুষের মমির সঙ্গে রাখা হতো। মন্দির গাত্রে এদের ছবি আঁকা হতো, মূর্তি নির্মাণ করা হতো। তাতে আবার ফারাওদের নাম খোদাই করা থাকতো।

প্রতি বছর মিশরীয়রা নীল নদের বন্যার জন্য অপেক্ষা করে থাকতো। কারণ ঐ বন্যার পর পলির ওপর ফসলের ফলন নির্ভর করতো। কাজেই এই বন্যার জল মিশরীয়দের জীবন যাপনের জন্য অত্যন্ত মহার্ঘ বস্তু ছিলো। ফি-বছর বন্যার জলের সঙ্গে প্রচুর কুমীরও আসতো নদীর উপরিভাগ থেকে। মিশরের লোকেরা মনে করতো জলের সঙ্গে কুমীর আসে না, কুমীরই জল নিয়ে আসে। ভগীরথের গঙ্গা আনার মতো আর কি! অতএব কুমীরের পূজো হতো। পবিত্র কুমীরকুলকে মারবেল প্যাথরের তৈরী জলাশয়ে রাখা হতো, ছায়াচ্ছন্ন পার্কের জলাধারে রাখা হতো, মন্দিরের পাশে। তারা সোনার আংটি, ব্রেসলেট পড়তো পায়ে, শিরোভূষণ ছিলো দামী পাথর আর খাবার খেতো রূপোর থালায়! প্রতি বৎসর নীল উৎসবে কায়রোতো একটি সুন্দরী কুমারীকে কুমীরের মুখে অর্ঘ্য দেওয়া হতো। এভাবেই কুমীরেরা বহুকাল মিশরের জনসাধারণের সংস্কারের ওপর নির্ভর করে রাজার হালে থাকতো। কিন্তু বেজিরা চিরদিন তা থাকতে পারেনি, যদিও সাপ মারতো বলে প্রাথমিকভাবে মিশরীয়দের কাছে বেজি ছিলো খুব প্রিয়। মিশরীয়রা কিছুদিন পরে লক্ষ্য করে যে বেজিরা কুমীরের ডিম খেয়ে নিচ্ছে। এ ব্যাপারটা সহ্য করার মতো ক্ষমতা মিশরীয়দের ছিলো না। কাজেই শুরু হয়েছিল বেজি নিধন, মিশরের বহু জায়গায়।

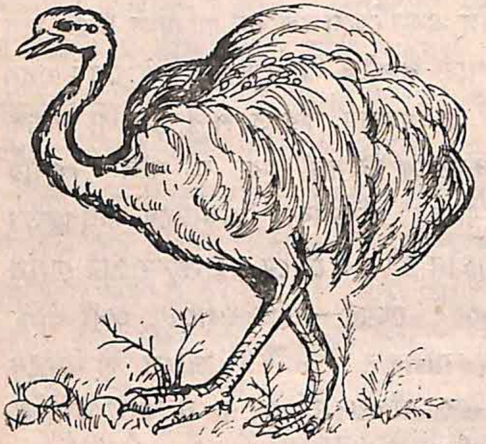
প্রাণিজগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক থেকে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সংস্কার (তা সে ভালোই হোক বা মন্দই হোক) সম্বন্ধে বলে শেষ করা যায় না। মানুষ যখন শিকারী ও সংগ্রাহক ছিলো তখন থেকে শুরু করে সভ্যতার শুরু পর্যন্ত প্রাণীদের সম্পর্কে বহু কিছু কল্পনা করেছে, প্রাণীদের ভয় করেছে, ঘৃণা করেছে আবার ভালোও বেসেছে। এই কল্পনা, ভয়, ঘৃণা, ভালোবাসা থেকে জন্ম নিয়েছে নানা ধরনের সংস্কার। এই কল্পনা থেকেই দুর্বোধ্য প্রাকৃতিক ঘটনার সঙ্গে এমনকি সৃষ্টিতত্ত্ব, দিনরাত্রির গমনাগমন ইত্যাদি সবকিছুর সঙ্গেই প্রাণিকুলকে জড়িয়ে ফেলে নানা সংস্কারের সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন পুরাণকথার বা 'মিথে'র। মিশরীয় আদিবাসীরা মনে করতো আদিতে ছিলো অন্ধকার, স্তব্ধতা ও বিশাল জলের আবরণ। তারপর সেই জল ভেদ করে উঠলো একটি পাহাড়। তার ওপরে বসেছিল একটি ব্যাঙ ও ব্যাঙটির পাশে ছিলো একটি ডিম। সেই ডিম থেকে বের হয়ে এসেছিল একটি রাজহাঁস। সেই রাজহাঁসটির কলধ্বনিতে স্তব্ধতার অবসান হলো। অন্ধকারও অবসিত হলো, কারণ রাজহাঁসটি সূর্যের মতো আলোক বিচ্ছুরণ করতো। ওই রাজহাঁসটিই সৃষ্টি করেছিল অন্যান্য প্রাণী ও মানুষ।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের অনেকে মনে করতো দুটি ভ্রাতৃপ্রতিম পাখির যুদ্ধ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল—পৃথিবী, গাছ, প্রাণী ও মানুষের। মেলানেশিয়ানরাও মনে করতো দুটি পাখি থেকেই সবকিছুর সৃষ্টি। পাখি থেকে সৃষ্টির কথা রাশিয়ার লিজেণ্ডেও পাওয়া যায়। আদিতে ছিলো জল ; আর ছিলো দুটি পাখি—একটি কালো, একটি সাদা। সাদা পাখিটি জলের উপরে উড়ে বেড়াত আর কালো পাখিটি জলে সাঁতার কাটতো। সাদা পাখিটি, কালো পাখিটিকে জল থেকে ডুব দিয়ে বালি ও পলি তুলতে অনুরোধ করেছিল। কালোটি তাই করেছিল, কিন্তু নিজের জন্য আলাদা করে খানিকটা কাদামাটি রেখে দিয়েছিল নিজের ঠোঁটে। সাদা পাখিটি যাদুমন্ত্রে কালোপাখিটির ঠোঁটের ঐ মাটিটিকে বড় করতে শুরু করেছিল। ঐ মাটির ঢিলটি বড় হতে হতে এমন অবস্থা হয়েছিল যে, কালোপাখিটি সেটা ফেলে দিতে বাধ্য হয়েছিল। ঠোঁটের ঐ বৃহৎ

মাটির তালটি থেকেই যত পাহাড়-পর্বতের উৎপত্তি এবং অন্যান্য মাটির তাল ভাল জমিতে পরিণত। আমাদের কাঠবেড়ালী দ্বারা সাগর বন্ধনের গল্পের কথা মনে পড়ে যেতে পারে। শুধু পাখি নয়, অন্যান্য প্রাণী থেকেও পৃথিবী সৃষ্টির কথা কল্পনা করেছিল মানুষ। অস্ট্রেলিয়ার একটি গল্পের উল্লেখ করছি। কোনো এক সময় একটি মহৎ ক্যাঙারু বাস করতো। তাকে কয়েকটি ভয়ংকর কুকুরে তাড়া করেছিল। যখন সে দেখলো যে তার আর কোনো পরিত্রাণ নেই, তখন সে ঠিক করলো, নিজের দেহখণ্ড থেকে পৃথিবী তৈরী করবে। যখন তাকে টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলা হয়, তখন তার যকৃৎ থেকে হলো পাহাড়, চামড়া থেকে শিলা, হাড় থেকে পাথর আর ঐ পাথর থেকে মানুষ! সুতরাং ক্যাঙারুই আমাদের সৃষ্টিকর্তা! এ প্রসঙ্গে আমাদের আদি কবি জয়দেবের 'প্রলয় পয়োধিজলে ধৃত বানসি বেদং'—ইত্যাদি দশাবতারের শ্লোকগুলি স্মরণ করা যেতে পারে। ভগবান প্রথমে মীন, তারপর কূর্ম, তারপর শূকরের শরীর ধারণ করছেন। আর তারপর একটি অদ্ভুত প্রাণী নরসিংহ। সৃষ্টিতে প্রাণীর অবদান সম্পর্কে Algonquin Indian-দের একটি চমৎকার লিজেণ্ড আছে। আদিতে সমস্ত চরাচর তুষারে ও জলে ভাসমান তুষার স্তূপে আচ্ছন্ন ছিলো। [মানুষের তুষার যুগের স্মৃতি?] জীবন তখন খুবই কষ্টের। সে সময় এক দয়ালু ভোঁদড় আকাশে কামড় বসিয়ে একটি ছিদ্র করলো। সেই ছিদ্র দিয়ে স্বর্গ থেকে ঝরে পড়লো বাতাস এবং সূর্যকিরণ। আবহাওয়া গরম হলো। তুষার গেল গলে। তারপর সেই ভোঁদড় একের পর এক খাঁচা খুলে পাখিগুলিকে উড়িয়ে দিল আকাশে। কিন্তু এসব করার জন্য স্বর্গের অধিবাসীরা ক্রুদ্ধ হয়ে দয়ালু ভোঁদড়টিকে মেরে ফেললো।

অবশ্য মানুষ যত বুদ্ধিমান হতে থাকলো, জ্ঞান যত বাড়তে থাকলো, ততই নিজেদের ওপর বিশ্বাসও বাড়তে থাকলো। কাজেই সৃষ্টির সংস্কারকার্যে অন্যান্য প্রাণীর পরিবর্তে নিজেকে ঢোকাতে চাইলো ক্রমশ। নিউজিল্যাণ্ডের আদিবাসীদের একটি পুরাণকথা বলে অধ্যায়টি শেষ করি ঃ

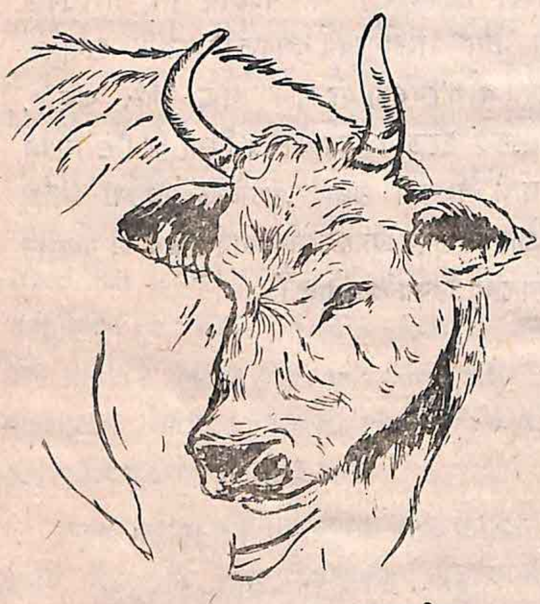
একদিন এমন ভয়াবহ ঝড় হলো যে সমস্ত প্রাণী ও মৎস্যকুল তাদের একমাত্র খুড়ো "তু—মাতাউয়েঙ্গি"-কে একলা ফেলে চারদিকে ছত্রখান হয়ে ছড়িয়ে গেলো। তু—মাতাউয়েঙ্গি এমন রেগে গেলেন যে জাল দিয়ে মাছ ধরতে শুরু করলেন এবং ফাঁদ পেতে প্রাণী। মানুষকেও শেখালেন এসব করতে। আর সেই যে মানুষ প্রাণিহত্যা করতে শুরু করলো আজও বোধহয় তার শেষ হলো না। দেবতাকে উৎসর্গ করা বা বলি দেওয়ার নামে এই সেদিন পর্যন্ত আমাদের পশ্চিমবঙ্গে অকাতরে প্রাণিহত্যা চলেছে। চলছে আজকেও। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে এই সংস্কারের ব্যাপ্তি ছিলো প্রচুর। স্তরভাগও ছিলো। যেমন—পাপস্খালনের জন্য পশু বলিদান, ধন্যবাদের জন্য পশু বলিদান ইত্যাদি। গ্রীসে বা রোমে ধন্যবাদের জন্য যে বলিদান তাতে বলিপ্রদত্ত পশুর নাড়িভুঁড়িগুলি পুড়িয়ে ফেলা হতো এবং পুরোহিত মাংসের ভাগ পেতেন। আবার পাপস্খালনের জন্য বলিদানে, যে ব্যক্তির পাপস্খালন তিনি কিছুই পেতেন না। পুরোহিতের হিতে যেতো পুরোটাই। কী ধরনের পশু বলিপ্রদত্ত হবে তাও স্থিরীকৃত হতো নানা সংস্কারের বশবর্তী হয়ে। প্রধানত স্বাস্থ্যবান গৃহপালিত পশুদের বলি দেওয়া হতো। গরু, ষাঁড়, বাছুর, ভেড়া, ছাগল, পায়রা—বলিপ্রদত্ত হতো। আমাদের হিন্দুধর্মেও নিয়ম প্রায় একই। তবে মহিষ ও ছাগ বলিদান প্রথাই প্রচলিত ছিলো বেশি আমাদের ধর্মে। আমরা কি প্রাচীন গ্রীস বা রোমের কাছ থেকে এ ধরনের প্রথা পেয়েছিলাম? অনুসন্ধানের বিষয় অবশ্যই।



রিয়া পাখি



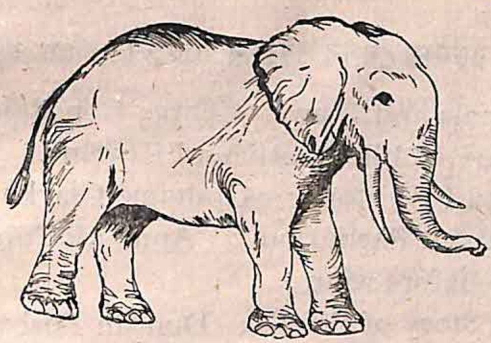
বিড়াল



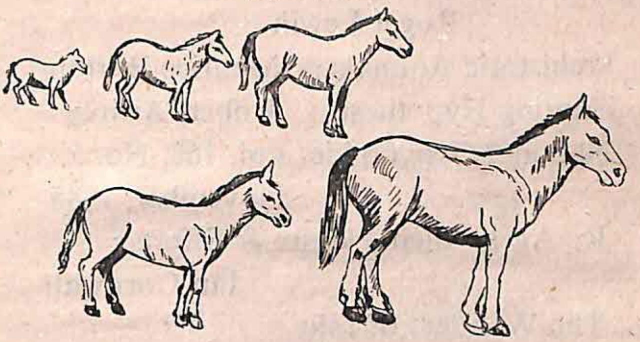
আওরকদের বংশধর যাদের থেকে আধুনিক গবাদি পশুর উদ্ভব



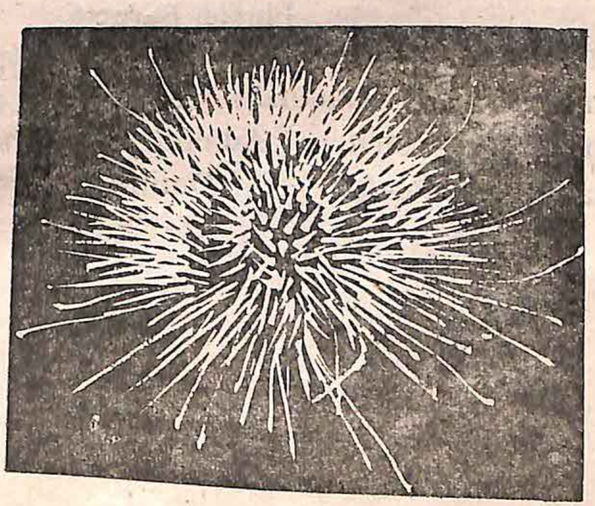
অস্ট্রিচ



আফ্রিকার হাতি



ঘোড়ার আদিপুরুষ



সী-আর্চিন

পুস্তকটি রচনায় যেসব বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে

১। Animals and Man : George Consdale

২। History of Life : Richard Cowen

৩। World Prehistory : Grahame Clark

৪। All about Early Man : Anne McCord

৫। Life Before Man
The Story of Fossils : Duncan Forbes

৬। Origins : Richard E. Leakey &
Roger Lewin

৭। Prehistoric Animals : Maurice Burton

৮। Hunting Hypothesis : Robert Ardrey

৯। National Geographic, Vol. 168, No. 5,
November, 1985

১০। Ice Ages—their Nature & Effects :
Ian Cornwall

১১। The Wonders of Life
on Earth : Editors of 'Life' &
Lincon Barnett

১২। পৃথিবী কি শুধু মানুষের জন্য ? ঃ তারকমোহন দাস

১৩। The making Of Mankind : Richard E. Leakey

১৪। The Life of Primates : Adolph H. Schultz

১৫। Man and Animals : Yuri Dmitriyev

—০—